মাতৃমন্দির সোপান-তলে

মাতৃমন্দির সোপান-তলে

ডঃ কৃষ্ণা কুণ্ডু এম. এ. পি. এইচ. ডি.
[বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস, রামমোহন কলেজ, কলিকাতা-৭০০ ০০৯]
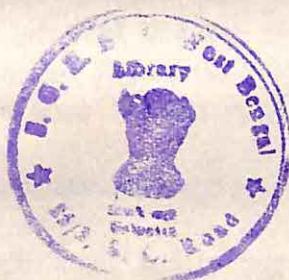
পারমিতা পাবলিকেশন
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
রত্না ঘোষ
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর : ১৯৮৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : স্বপন রুদ্র

মুদ্রক :
জি. সি. শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ তারক চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৫

দাম : আট টাকা মাত্র

ভূমিকা

ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্য শাসন করবার সুযোগ পেয়ে গেল। বুদ্ধির জোরে আর অস্ত্রের জোরে এরা আস্তে আস্তে সমস্ত দেশটারই মালিক হয়ে বসলো। ভারতের রাজা রাজড়াদের নিজেদের দুর্বলতা আর ঝগড়া-বিবাদের সুযোগটাই এরা নিয়ে নিল। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর থেকে এদেশের শাসন কাজে এরা মাথা গলাতে থাকে। সব সুবাগুলিই ক্রমে এদের হস্তগত হয়ে যায়। মুঘল বাদশাহ দিল্লীতে রইলেন বটে, কিন্তু তিনি নামেই বাদশাহ রইলেন।

১৮৫৭ সাল পর্যন্ত চললো কোম্পানীর শাসন। তারপর ভারতে মহাবিদ্রোহ হল। এতবড় দেশ একটা কোম্পানীর হাতে রাখা ঠিক নয় ভেবে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট আইন করে ভারতে ব্রিটিশ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন কায়েম করলেন। শুরু হল ইংলণ্ড রাজের শাসন।

কিন্তু এদেশের মানুষ কোনদিনই এই বিদেশীর শাসন মেনে নিতে পারে নি। এরা যে অত্যাচার করতো, ভারতকে শুষে নিজেরা ধনী হতে চাইতো এসবই ভারতের লোক বুঝতে পেরেছিল। এদের বিধি নিষেধে এদেশের কৃষক, তাঁতি প্রভৃতি কারিগর, ছোট ছোট জমির মালিক, রাজ্যচ্যুত রাজা নবাব, কাজ হারানো সৈনিক, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ক্ষেপে উঠলো। শুধু স্বার্থপর কয়েকজন রাজা-নবাব, জমিদার, মহাজন আর বড় ব্যবসায়ী এদের পছন্দ করতো। যাই হোক ওদের সমান অস্ত্রশস্ত্র, টাকা-পয়সা না থাকলেও এদেশের মানুষ প্রথম থেকেই এই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কত-শত মানুষ নিজেদের প্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেয়েছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছে।

সেইসব অগণিত শহীদদের সকলের নামও হয়তো আমাদের জানা নেই। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই আমরা প্রণতি জানাই।

আমার দেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস জানবার একটা আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। তাদের জন্যই এই লেখা। এই বই ছোটদের জন্যই। সকল শহীদদের কাহিনী একসঙ্গে জানানো সম্ভব নয়, তাই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের কথাই লিখলাম।

—লেখিকা

সূচীপত্র

মজনু ফকির

সন্ন্যাসী আর ফকিরদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় বাংলা, বিহারের নানা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে। ক্রমে এরা কৃষকে পরিণত হয়। কৃষিকাজ করতে গিয়ে জমিদার আর তাদের প্রভু ইংরেজ কোম্পানীর হাতে এদের নানা দুর্দশা হতে থাকে। এরা কিন্তু সকলেই এই অত্যাচার সহ্য করতে রাজী হল না। এর ওপর আবার তাদের ধর্মানুষ্ঠানের ওপরও নানা বিধিনিষেধ চাপান হ'ল। দল বেঁধে উত্তর ভারতে ঘুরে বেড়ান ইংরেজ বন্ধ করে দিল। ক্রমে সন্ন্যাসী ও ফকিররা তাদের অসন্তোষকে প্রকাশ করতে শুরু করে। এরা আলাদাভাবে আবার মাঝে মাঝে একসঙ্গে মিলে জমিদারদের বিরুদ্ধে, কোম্পানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত। এই বিদ্রোহগুলিকে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ', 'ফকির বিদ্রোহ' বলা হয়। এদের সঙ্গে আবার মুসলমান নবাবদের পুরনো সৈনিকরা বাংলা বিহারের অসন্তুষ্ট কারিগর আর কৃষকরাও যোগ দিয়েছিল। একেক জায়গায় এক একজন এক এক দলের নেতা হয়ে লড়াই করতেন। এদের মধ্যে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, অনুপনারারণ, মুশা শাহ, চেরাগালি, মজনু শাহ ছিলেন প্রধান। এই মজনু শাহের লড়াই-এর কথাই এখানে পড়বো।

মজনু শাহকে লোকে চিনতো মজনু ফকির বলে। ঠিক কোন সালে এবং কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলা যায় না। তবে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১২৭৬ সালে সর্বনাশা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তিনি দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মানুষের এত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও কোম্পানীকে খাজনা দেওয়া থেকে রেহাই ছিল না। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেও চুপ করে থাকতে পারলেন না। উত্তরবঙ্গে তিনি একটি দল গঠন করে মহাস্থানগড়ের দুর্গে ঘাঁটি তৈরী করলেন। কিন্তু ১৭৭১ সালে তিনি ইংরেজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হন।

মজনু শাহ বুঝেছিলেন যে একা বা আলাদা আলাদাভাবে বিদ্রোহ করে কোম্পানীর সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। তিনি বিহার বাংলার বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐক্য আনবার চেষ্টা করলেন। নাটোরের রাণী ভবানীর কাছেও নাকি তিনি সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন।

মজনু শাহ নিজের দলকে একটা নিয়মের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন কামারশালা থেকে অস্ত্র তৈরী করিয়ে সৈন্যদলকে সুসজ্জিত করেছিলেন। নাটোর, বগুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গায় অত্যাচারী, ধনী জমিদারদের এবং কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিদের বাড়ী কাছারী আক্রমণ করে লুটপাট করতেন। তাদের নিপীড়ন করে নিরীহ ভারতীয় কৃষকদের ওপর প্রতিশোধও নিতেন। কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসীর উপর কখনও অত্যাচার করা হোত না। এ কারণে সাধারণ মানুষ এইসব বিদ্রোহীদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। বগুড়াতে তো গ্রামবাসী মজনু শাহর দলকে খাবারও যোগান দিয়েছিল।

বাংলার গভর্ণর জেনারেল নানাভাবে বিদ্রোহ দমন করার ব্যবস্থা করছিলেন। সন্ন্যাসী ফকিররা যাতে তীর্থে যেতে না পারে তার জন্য তো কর বসানো হয়েছিলই পরে তীর্থ ভ্রমণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিদ্রোহীদের পালাবার পথগুলিও বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিছুদিন বিদ্রোহীরা, চুপচাপ থাকতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু মজনু ১৭৭৬ সাল থেকে আবার লড়াই করবার জন্য উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে এসে উপস্থিত হলেন। ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাল আর তাদের রাজস্বের টাকা সুরক্ষিত করে রাখল। প্রচণ্ড লড়াই দু'দলের মধ্যে হল তবে জয় পরাজয় কিছু হল না। ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতি আহত হলেন, মজনু দলবল নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন। পরে তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গার জমিদারদের কাছ থেকে জোর করে কর আদায় করলেন। মাঝে মাঝেই কোম্পানীর টাকা লুঠ করলেন। তিনি ময়মনসিং জেলায় এলে তাঁকে কোম্পানী ঐ জেলার থেকে বহিষ্কার করল। তিনি ময়মনসিং ছেড়ে যান বটে কিন্তু আবার এসে উপস্থিত হন। এই সময়ে তাঁর প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন বিদ্রোহী দলকে ঐক্যবদ্ধ করে একসঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামা। এই কাজে আবার তিনি ময়মনসিং-এ এলেন। কিছুতেই তাঁকে কোম্পানীর লোক গ্রেপ্তার করতে পারল না। কোম্পানীর লোক ময়মনসিং-এ উপস্থিত হ'ল তাঁকে বন্দী করার জন্য। কিন্তু এ খবর আগেই পেয়ে গেছেন মজনু। তারা আসতে না আসতেই ময়মনসিং ছেড়ে মালদহে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। কোম্পানীর লোকও তাঁদের

সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তাঁরাও উত্তরবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কোম্পানীর টাকা, জমিদারদের কাছারী লুট করতে থাকেন। শেষে বগুড়ার কাছে কালেশ্বরে ইংরেজ সৈন্য মজনুর বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। তাঁদের সঙ্গে ছিল প্রচুর গোলা বারুদ। মজনু আর তাঁর বাহিনী খোলা তলোয়ার হাতে যুদ্ধ করতে করতে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্য দিয়ে পথ করে নিরাপদ জায়গায় চলে যান। তাঁর বহু অনুচর মৃত্যুবরণ করেন। অনেক সৈন্য আহত হয়, তিনি নিজেও আহত হন।

বিশ্বস্ত অনুচরেরা অসুস্থ নেতাকে রক্ষা করার জন্য বহু চেষ্টা করলেন। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য পালিয়ে পালিয়ে তাঁরা এসে উপস্থিত হলে বিহারের মাখনপুরে। সেইখানে মজনু শাহের জীবনাবসান হ'ল।

মজনুর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই মুশা শাহ এবং অনুচর ফেরাগুল শাহ, চেরাগালি শাহ প্রভৃতি নেতারা কিছুদিন বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। এদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে পড়ে। একদিকে সুযোগ্য নেতার অভাবে আর কোম্পানীর কঠোর দমননীতির ফলে সন্ন্যাসী আর ফকির বিদ্রোহ ক্রমশ থেমে যায়। কিন্তু এই বিদ্রোহীরা ভারত-বাসীকে স্বাধীনতার পথের ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাঁশের কেল্লা

বাংলার এক দামাল ছেলের কাহিনী এবার শোন, অতি সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে যিনি একদিন দেশের আকাশ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, অত্যাচারী জমিদার আর তাদের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আজীবন লড়াই।

ছেলেটির পোষাকী নাম ছিল মীর নিশার আলি। কিন্তু ডাকতো সকলে তিতু বা তিতুমীর নামে। বাড়ী ছিল বাহুরিয়া থানায়—এখন যে থানা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাহুরিয়ার হায়দরপুর গ্রামে। সাধারণ কৃষক ঘরের ছেলে—বেশী লেখাপড়ার সুযোগ কই ? ছেলেবেলা থেকে খাটাখাটুনিতেই অভ্যস্ত। আর তাতেই হ'ল সুন্দর স্বাস্থ্য—চেহারাতো ছিল ভালই। ছোটবেলা থেকেই শরীরচর্চা করতে সে ভালবাসতো, লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, ধনুক চালানো—সবেতেই হয়ে উঠল পারদর্শী।

এই স্বাস্থ্যের জন্য আর এতসব জানার জন্য চাকরী মিলে যায় জমিদারের সেরেস্তায়। কিন্তু জমিদারে জমিদারে লড়াই-এ প্রাণ যায় উলুখড়ের। তাই হ'ল, এক মারামারিতে অভিযুক্ত হওয়ায় তিতুর হ'ল জেল। জেল থেকে ফিরে ঐ চাকরী করতে আর মন চাইল না। দাও ছেড়ে চাকরী। তখন ইচ্ছে হ'ল তীর্থ করার। তিতু গেলেন মক্কায়।

মক্কা থেকে তিতু ফিরলেন অন্য মানুষ। আরব দেশে আবদুল ওয়াহাব ইসল[illegible] ধর্মের মধ্যে যে সব অর্থহীন আচার ঢুকে পড়েছে সেগুলির সংস্কার করতে আন্দোলন শুরু করেছেন। রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ মক্কায় এই আন্দোলনের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছেন। তিতুর সঙ্গে সৈয়দ আহম্মদের দেখা হ'ল। তিনিও ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষা নিলেন।

তিতু ফিরলেন দেশে। মন চঞ্চল অথচ কি করবেন স্থির করতে পারেন না। সৈয়দ আহম্মদ প্রচারের জন্য কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তিতু

নিজের কর্তব্য স্থির করলেন। ইসলামকে কুসংস্কার মুক্ত করতে হবে। তিনি বললেন যে ঋণ নিয়ে সুদ দেব না,—সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ। এতেই কিন্তু মহাজনেরা আর জমিদারেরা গেল চটে। কিন্তু যশোর, নদীয়া, ২৪ পরগণার দরিদ্র মুসলমান চাষী, আর বেকার তাঁতীরা তিতুমীরের দলে যোগ দিল। তিতু যে শুধু ধর্মের কথা বললেন তা নয়। তাঁর আক্রমণ হ'ল ধনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। তাঁর কাজের কেন্দ্র নারকেলবেড়িয়াতে হ'ল তাঁর অপ্রতিহত প্রতাপ। ধনী সম্প্রদায়, মহাজনরা, হিন্দু-মুসলমান জমিদার আর নীলকর সাহেব সকলেই তিতু আর তাঁর দলের ওপর ভয়ানকভাবে চটে গেল।

ঐ চটে যাওয়া জমিদারদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তিনি ওয়াহাবী প্রজাদের শাস্তি দিতে যে কাজ করলেন তাতে হল বিপরীত। মুসলমান প্রজাদের দাড়ির ওপর আড়াই টাকা কর দিতে হবে বলে তিনি ঘোষণা করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন জমিদার ঐ কর বসালেন। তিতুমীর এই ঘোষণা শুনে পাল্টা ঘোষণা করলেন যে কেউ ঐ কর দেবে না। কৃষ্ণদেব রায়ের কিছু প্রজা ঐ কর দিলেও বেশীর ভাগ প্রজাই কর দিল না। সর্পরাজপুরে তো জমিদারের লোকের সঙ্গে দাঙ্গা বেঁধে গেল তিতুর লোকেদের। দু-পক্ষই বাদুড়িয়া থানায় এজাহার করলে। দারোগা রামরাম চক্রবর্তী তদন্ত করে রিপোর্ট দিলেন। কি রিপোর্ট বলতো ? দারোগা লিখলেন তিতুর লোকেরা নিজেরা নামাজঘর পুড়িয়ে জমিদারের নামে দোষ দিয়েছে। তিতুর দল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দারোগার নামে নালিশ করলে জমিদার, দারোগা, বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—সকলেই একজোট হলেন তিতুর বিরুদ্ধে।

তিতু বললেন যে নালিশ করে কিছুই হবে না। ইংরেজ সরকার ঐ অত্যাচারী জমিদারের প্রধান সহায়ক। তিতু জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হলেন। নারকেলবেড়িয়াতে চাল ও অন্যান্য খাবার, অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হ'ল। তিতু পুড়াগ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ী আক্রমণ করলেন। অবশ্য জমিদার বাড়ী থেকে বের হলেন না। ছাদ থেকে ইটপাটকেল বৃষ্টি করে তিতুকে তাড়ানো গেল। কিন্তু এতে দমবার লোক তিতু ন'ন। তিনি ঘোষণা করলেন ইংরেজ কোম্পানীকে তিনি মানেন না। ইংরেজগণ মুসলমান শাসককে সরিয়ে ক্ষমতা পেয়েছে। মুসলমানরাই এদেশের আসল শাসক। তিতু নিজেকে ঘোষণা করলেন সেই শাসকের উত্তরাধিকারী বলে ; আর দাবী করলেন খাজনা।

প্রথমেই গোলমাল লাগলো গোবরডাঙ্গার জমিদারের সঙ্গে। গোবরডাঙ্গার জমিদার তিতুকে কর দিতে অসম্মত হলেন আর পাইক, বরকন্দাজ প্রস্তুত করলেন তাঁর বিরুদ্ধে। বন্ধু মোল্লাহাটির নীলকর ডেভিস সাহেব তিতুকে আক্রমণ করেন। চরের মুখে আগেই খবর পৌঁছে গেছে যে ডেভিস আসছে। তিতুও প্রস্তুত। ডেভিসের বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা গেল। ডেভিস গেলেন পালিয়ে। তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্য গোবরা, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়ের সঙ্গে বাঁধলো লড়াই। এই লড়াই-এও জিতলেন তিতু। যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন দেবনাথ।

তিতু এবার অঞ্চলের লোকজনকে জমিদারদের কাছে খাজনা না দিতে নির্দেশ দিলেন। অনেকেই খাজনা দেওয়া বন্ধ করলো। জমিদারেরা নীলকর সাহেবরা সকলেই ছোট লাট সাহেবের কাছে আবেদন জানালেন। তিতুকে এখনই দমন করা দরকার। কলকাতা থেকে একদল সিপাইকে যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে পাঠানো হ'ল তিতুর বিরুদ্ধে। আলেকজাণ্ডার এবং-সিপাই এর আসার খবর এ সবই পৌঁছে গেছে তিতুর কাছে। ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর সকালে আলেকজাণ্ডার দলবল নিয়ে নারকেলবেড়িয়াতে ঢুকে দেখল তিতুর দল তাঁদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তিতুর দল ঘিরে ফেললো সিপাইদের। ইট, লাঠি, তরোয়াল আর বল্লমের কাছে বন্দুক গেল হেরে। আলেকজাণ্ডার সাহেব গেলেন পালিয়ে। আর সেই রামরাম চক্রবর্তীও এসেছিলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গেলেন তিনি।

তিতুমীরের আত্মবিশ্বাস আরও জোরদার হ'ল। তাঁর লোকজনেরও মনোবল বৃদ্ধি পেল। এবার তিতু সকলের মত নিয়ে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর মন্ত্রীসভা তৈরী হ'ল। প্রধানমন্ত্রী হলেন মৈনুদ্দিন। প্রধান সেনাপতি হলেন তিতুর ভাগনে মাসুম খাঁ। দলে দলে গরীব মানুষ তিতুর দলে চলে এল। তারা মনে করেছিল তিতু তাঁদের রক্ষা করবে। মুসলমান হোক আর হিন্দুই হোক সকলেই তো জমিদার—মহাজন—নীলকর অ কোম্পানীর শাসনে অস্থির ছিল। স্বাধীনতা ঘোষণা করেই তিতু সন্তুষ্ট হ বসে রইলেন না। আত্মরক্ষার আয়োজন চললো। অসংখ্য বাঁশ দিয়ে তৈরী হল সেই বিখ্যাত 'বাঁশের কেল্লা'। কেল্লার ঘরে ঘরে মজুত করা হ'ল লাঠি, সড়কি, বর্শা, তরোয়াল, ইটের টুকরো আর কাঁচা বেল। খাবার জিনিসও মজুত করা হ'ল।

ওদিকে শত্রুপক্ষও চুপ করে রইল না। গভর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্ক নদীয়ার

কালেকটর আর জজকে দায়িত্ব দিলেন নারকেলবেড়িয়া আক্রমণের। আগেই কালেকটর সাহেবের কাছে জমিদারেরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, চলো সকলে মিলে তিতুকে হারাই। এখন সকলের সৈন্য একত্র হ'ল। নদীয়ার জমিদারের লোকজন, গোবরডাঙ্গার জমিদারের লোকজন কালেকটর সাহেবের দলে যোগ দিল।

তিতুর সেনাপতি মাসুম কিন্তু বাঘারিয়ার নীলকুঠিতে ঘাঁটি তৈরী করে বসে আছেন। কালেকটর এখানে এসে আক্রমণ করতে গেলেন। কিন্তু ইট আর বেলের ঘায়ে তাঁদের পালাতে হ'ল। অনেকে মারা গেল।

এরপর তিতুর প্রতিপত্তি আর সম্মান অনেক বৃদ্ধি পেল। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীও তাঁকে একেবারে শেষ করার জন্য তৈরী হ'ল। এবার পাঠানো হ'ল একজন কর্ণেলকে, আর সঙ্গে শুধু দেশীয় সিপাই আর বন্দুক এল না— এল দুটি কামান আর একদল গোরা সৈন্য। যেদিন সন্ধ্যায় এই দল এল, মাসুম তাদের ওপর ইট বর্ষণ করে অনেককে আহত করলেন। কিন্তু পরদিন ১৪ই নভেম্বর (১৮৩১ সাল) কর্ণেল বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করলেন। তিতুর লোকজন সমানে তীর আর ইট ছুঁড়ে গেল। আর ওদিক থেকে ছুটে এল গুলি, কিন্তু গুলির আঘাতে বাঁশের কেল্লার বিশেষ ক্ষতি হ'ল না। এদিকে ইংরেজ পক্ষে আহতদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তখন কর্ণেল আদেশ দিলেন কামান দাগতে। কামানের গোলার কাছে কি আর বাঁশের কেল্লা দাঁড়াতে পারে। ভেঙে গেল দেওয়াল, গোলা এসে আঘাত করলো স্বয়ং তিতুকে। তিতু নিহত হলেন। আর কেল্লাকে ভূমিস্যাৎ করে অসংখ্য লোককে বন্দী করে কর্ণেল ফিরলেন কলকাতায়। এদের বিচারও হ'ল। মাসুমের হ'ল প্রাণদণ্ড। কারও হ'ল দ্বীপান্তর, কারও বা জেল।

তিতুমীর শুধু বাংলার কেন, ভারতের এক দামাল ছেলে তিনি সাধারণ কৃষককে মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ দেখাতে পেরেছিলেন। ইসলামের ধর্মের কথা দিয়ে আরম্ভ করলেও যাঁর উদ্দেশ্য, যাঁর কাজ শুধু একটি ধর্মের জন্য বা একটি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে থাকেনি। নদীয়া, ২৪ পরগণা, ফরিদপুরের সব সম্প্রদায়ের কৃষকই তাঁকে জেনেছিল মুক্তিদাতা বলে। তিনি চেয়েছিলেন দেশকে শোষণের হাত থেকে, অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে। তিনি চেয়েছিলেন বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। নিজে পারেন নি তাতে কি ? দেশবাসীকে শিখিয়ে তো গেলেন কেমন করে হয়— 'বল উন্নত মম শির'।

হুল, হুল

সাঁওতালদের নাম তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ভারতের মাটিতে যারা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল, সেই সব মানুষদের একদল হ'ল সাঁওতাল। বন-জঙ্গল কেটে সমান করে বুনো জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে এরা চাষের জমি তৈরী করেছিল, বসতি গড়েছিল। এদের নেতা ছিল গ্রামের মোড়ল। সারাদিন খেটে-খুটে, সন্ধ্যায় মাদল বাজিয়ে নাচগান করে আর দেবতা মারাংবুরুর পূজো করে এদের দিন কেটে যেতো। এরা গরীব ছিল বটে কিন্তু আনন্দে দিন কাটাতে জানত। এরা বিহারেই বাস করত। ক্রমে বসতি গড়ে তোলে রাজমহল, ভাগলপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কিছু অঞ্চলে। বাসভূমির নাম দেয় দামিন-ই-কোহ্।

কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী আর তার দলবল ওদের শান্তিতে থাকতে দেবে কেন? এসব জমিগুলো, খাজনা সবই তো তাদের চাই। কোম্পানী খাজনা চাইল টাকায়। মহাজন জাঁকিয়ে বসল আর গরীব লেখাপড়া না জানা লোকগুলোকে চড়া স্থদে টাকা ধার দিতে লাগলো। কোথা থেকে শোধ দেবে তারা? বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ওদের দাসের কাজ করতে হ'ল। সব ভাল জমি ওরা দখল করলো আর সেই জমিতে নামমাত্র মজুরিতে সাঁওতালরা খাটতে গেল। কখনও বা বিনে মজুরীতে বেগার দিতে হ'ল। আর ব্যবসাদারেরা বেশী দামে তো জিনিসপত্র বিক্রী করতই, ওজনেও ঠকাত।

যে বাটখারায় ওজন করে জিনিসপত্র বেচতো সেটা হ'ত হালকা। খুব স্থবিধেয় ঠকিয়ে কম মাল দেওয়া যেত। এই বাটখারার বেশ আদরের নাম দিয়েছিল তারা বড় বেট, বড়বৌ বা বেচারাম বাটখারা। আর ভারী বাটখারা দিয়ে মেপে সাঁওতালদের কাছ থেকে ফসল কিনতো তারা, কেমন বেশী বেশী ফসল নিয়ে নেওয়া যেতো—এই বাটখারার নাম ছোট বেট বা কেনারাম। সরল সাঁওতালরা বুঝতেই পারতো না কিছু। আর বুঝতে পারলেই বা শুনছে কে?

পুলিশ, দারোগা, ম্যাজিষ্ট্রেট সব তো এদের দিকে। মহাজনেরা পুলিশের সাহায্যে যখন তখন সাঁওতালদের বাড়ী দখল করে নিত ফসল, মুরগী, ডিম সব কেড়ে নিত।
কিন্তু এত কি সহ্য করা যায়? কে বলবে ওদের কথা। কে প্রতিবাদ করবে। হ্যাঁ করবে প্রতিবাদ। পড়ে মার আর খাবে না। সাঁওতাল ভগনাদিহি গ্রামের চুণার মুর্মুর বাড়ীতে জন্মেছেন চার ভাই। চুণারের চার বেটা—সিধো, কাণহু, চাঁদ আর ভৈরব। আমরা আছি—আমরা আমাদের কথা বলবো। চুপ করে বসে আর কারও চোখ রাঙানো দেখবো না।
সিধো আর কাণহু পরামর্শ করেন। একা তো কোন কাজ হবে না। সবাইকে একজোট হতে হবে। সবাই মিলে কলকাতাতে কোম্পানীর কর্তাদের কাছে জানাতে হবে এই অবস্থার কথা। সাঁওতালদের ওপর অত্যাচার চলবে না। সিধো কাণহু জানতেন যে সরল, সাধাসিধে মানুষদের মন জয় করতে হলে ঠাকুর দেবতার দোহাই দিতে হবে। সিধো কাণহুর কাছে রাতের বেলা সাঁওতালদের পোশাক পরে সাদা ধপধপে গায়ের রং এক ঠাকুর এসেছিলেন। ঠাকুর ধর্মের লিখন দিয়ে গেছেন ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় লিখে। সিধো জানালেন পাড়াপড়শীকে এই কথা। বাড়ীতে ঠাকুরের মূর্তি তৈরী করে উঠোনে তাঁর পূজো হ'ল। পাড়াপড়শী ছুটে এ'ল। আর সবাইকে জানাবার জন্য, ডাকবার জন্য শালগাছের ডাল, যাকে ওরা বলতো 'গিরা' তাই পাঠান হ'ল। 'গিরা' পাঠানোর মানে হ'ল ধর্মের নামে সবাইকে একজায়গায় ডাকা হচ্ছে। জমায়েতের তারিখ ছিল ১৮৬৫ সালের ৩০ শে জুন। সব কাজ ফেলে দলে দলে সাঁওতাল তাদের রঙীন কাপড় পড়ে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, যার যা আছে নিয়ে চললো ভাগনাদিহির মাঠে। চারশো গ্রামের প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল জমা হ'ল সেই মাঠে। তোমরা তো অনেক মিটিং দেখেছ। মিটিং-এর কথা শুনেছ। ভাবোতো একবার সেই মিটিংটার কথা যেখানে অতগুলো লোক জমা হয়েছে। বক্তৃতা দেবেন দুটি যুবক যারা কোনদিন কোন মিটিং-এ বক্তৃতা দেয়নি। আর ভাবতেই পারেন নি যে, এত লোক আসবে। আর সেই মিটিং এ তো ত মাইকও ছিল না। সেই বিশাল লোককে সামলালেন ওরা দুই বড় ভাই আর ছোট দুই ভাই আর তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কিরতা মাঝি, ভাদু মাঝি, সুন্নো মাঝি আরও কয়েকজন। সিধো স্বাধীন সাঁওতালদের কথা বললেন, জানালেন কেমন করে একদিন হারিয়ে গেল স্বাধীনতা। তিনি বললেন যে ঠাকুর তাঁকে জানিয়েছেন যে এই অত্যাচার আর সহ্য করা হবে না,

সমস্ত অত্যাচারীকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, স্বাধীন সাঁওতাল ভূমি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দাবীপত্র তৈরী করা হ'ল সিধোর নির্দেশে। পনেরো দিনের মধ্যে উত্তর চেয়ে দাবীপত্র পাঠান হ'ল ভাগলপুরের কমিশনার, কালেকটর আর ম্যাজিষ্ট্রেটকে, বীরভূমের কালেকটর আর ম্যাজিষ্ট্রেট, দীঘি আর থানার দারোগাকে, আর কয়েকজন মহাজনকে, কেউই উত্তর দিলো না। তখন শুরু হল এক পদযাত্রা। চলো কলকাতা, সেখানে কোম্পানীর কর্তাদের কাছে যেতে হবে। হাজার হাজার সাঁওতাল চললো এই যাত্রায়। পাঁচক্ষেতিয়ার বাজারে পূজো দিয়ে যাবে এরা ক'লকাতায়। তখন খবর এলো কেনারাম মহাজন মহেশ দারোগাকে নিয়ে গর্ভু মাঝি আর হাড়মা মাঝিকে, গ্রেপ্তার করে তাঁদের জিনিসপত্র এমন কি হাড়মার ছেলেকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সিধো আর কাণহু ২০০০ লোক নিয়ে ছুটলেন সেখানে। তাঁরা ছিনিয়ে নিলেন গর্ভু-হাড়মাদের। মহেশ দারোগা আর কেনারাম মহাজনকে নামিয়ে দিলেন ঘোড়া থেকে। মহেশ দারোগা হুকুম দিলে বাঁধো সিধো কাণহুকেও। এত বড় কথা-আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠলো সাঁওতাল—হুল, হুল। মানে কি জানো, বিদ্রোহ? মহেশ আর কেনারাম দুজনকেই হত্যা করলো তাঁরা।

এর পর সাঁওতালেরা আর থামলো না, পাঁচক্ষেতিয়ার পাঁচ অত্যাচারী মহাজন, দারোগা খানসাহেব আর প্রতাপ-নারায়ণ নিহত হলো। বারহাইত ছিনিয়ে নিলো কোম্পানীর কাছ থেকে। সিধো, কাণহু, গোষ্ঠ, সিংরাই নাকাড়া বাজিয়ে সাঁওতালদের জমা করেন। কয়েকটা নীলকুঠি, মহাজনদের খামার বাড়ী লুঠ হয়ে যায়। পাকুড়ের রাজবাড়ীতেও প্রবেশ করেন সিধো। ইংরেজ কোম্পানী আর দেরী করলো না। সৈন্য পাঠানো হ'ল। পীরপৈতি গ্রামের যুদ্ধে এবং সাঁওতালদের তীরের কাছে হার মানতে হ'ল ইংরেজদের বন্দুকের গুলিকে। পাঁচঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হ'ল আর হেরে গেল ইংরেজ সৈন্য। খয়রার যুদ্ধেও তারা হারলো। এরপর যেন ইংরেজ কোম্পানীও ক্ষেপে গেল। একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল, বারহাইত থেকে সাঁওতালদের তাড়ানো গেল। আর সিধোর নিজের গ্রাম ভগনাদিহির কি হ'ল জানো? গ্রামের মধ্যে ঢুকে ইংরেজ সৈন্য শিশুদের, মেয়েদের আর বৃদ্ধদের ওপর চালালো গুলি, জোয়ান পুরুষরা তো গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেছে। গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয় সৈন্য। সেই ধোঁয়া দেখে স্থির থাকতে না পেরে পুরুষরা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় দেহগুলি। একের

পর এক জায়গায় যুদ্ধ বাঁধে দু দলে। সংগ্রামপুরের যুদ্ধে নিহত হলেন চাঁদ। সিধো, কাণহুও আহত হলেন আর এক যুদ্ধে। ইংরেজ কোম্পানী ক্ষেপে গেছে। ধরিয়ে দাও সর্দারদের—অনেক টাকা পাওয়া যাবে। চারিদিকে ধর পাকড়, ৬০ বছরের বুড়ো থেকে ১৬ বছরের তরুণ সাঁওতাল বন্দীতে ভরে গেল জেলখানা। তবু চলে লড়াই। ভাগলপুরের কাছে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে নিহত হলেন ভৈরব। ক্রমে সাঁওতালদের মনের জোর কমে যায়। অত্যাচার আর লাঞ্ছনা চারিদিকে—কোথায় সিধো কোথায় কাণহু। হায় রে শেষকালে অত্যাচার সইতে না পেরে দেশের লোকই জানিয়ে দিলে তাদের আস্তানা। গ্রেপ্তার হলেন দুইভাই আরও চারজন নেতা।

বিচার হ'ল তাদের। হায় বিচার একটা হ'ল বটে। কিন্তু কি করা হবে এদের নিয়ে তাতো ঠিকই করা আছে। এক সাঁওতাল লেখক অবশ্য লিখেছেন, সিধো যুদ্ধেই মারা যান; কাণহু ও কয়েকজনের ফাঁসি হয়, কয়েকজনকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এক ইংরেজ লেখক বলেছেন বারহাইতে সিধোর ফাঁসি হয়। আর এক লেখক বলেছেন সিধো, কাণহু দুই ভায়েরই ফাঁসি হয়েছিল।

প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাঁওতালকে এই বীর নেতারা চালনা করেছিলেন। রক্তের অক্ষরে নিজেদের নাম অক্ষয় করে লিখে গেলেন এঁরা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে।

মৌলবী আহ্‌মদ উল্লাহ্ শাহ

১৮৫৭ সালে প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এক মহাবিদ্রোহ শুরু হয়। একদিনে এ বিদ্রোহের শুরু হয় নি, অনেকদিন ধরেই বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে পড়েছিলো গ্রাম, শহরে। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড আর তাদের আশে পাশে এই বীজ ছড়ানোর কাজ করেছিলেন এমন একজন লোক, যিনি একই সঙ্গে ছিলেন এক সন্ত আবার সৈনিক। ভারী সুন্দর ছিল তাঁর চেহারা, হাঁটা-চলা, গলার স্বর, সব কিছুতেই ফুটে উঠতো তাঁর বুদ্ধি, মর্যাদার ছাপ। বড় বড় গভীর চোখ দু'টি সব মানুষকে আকর্ষণ করতো। চোখ দিয়ে যেন তিনি মানুষের ভিতরটাও দেখে নিতেন।

ইনি হচ্ছেন মৌলবী আহম্মদ্ উল্লাহ শাহ। ছোটবেলায় কিন্তু এঁর নাম ছিল আহ্‌ম্মদ্ আলি। জিয়াউদ্দীন তাঁর আর একটা নাম। দাক্ষিণাত্যের আর্কটের নবাব পরিবারে এঁর জন্ম। ঠাকুরদা মহম্মদ আলির ছিল ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বাবা গুলাম হোসেন মাদ্রাজে বসবাস শুরু করেন।

ঠিক কোন সালে আহ্‌ম্মদ জন্মেছিলেন বলা যায় না। তবে ১৭৮৭ থেকে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম বলে মনে করা হয়। ছোটবেলা থেকে ধর্মের দিকে তাঁর মন ছিল। ধর্মশাস্ত্র পড়তে তাঁর খুব ভাল লাগতো। সুন্নী মতবাদ সম্পর্কে তিনি অনেক পড়াশুনা করে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ক্রমে রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়। অবশ্য তখনই রাজনীতির কোন কাজে তিনি যোগ দেন নি। তিনি লণ্ডনে যান। ফেরার পথে মক্কা, মদিনা, ইরাক, ইরাণ, প্রভৃতি দেশ ঘুরে আসেন।

এতসব দেশ ঘুরে, নানা ধর্মের নানা মতের মানুষের সঙ্গে মিশে আহ্‌ম্মদ বুঝলেন যে, উদারতাই শ্রেষ্ঠ পথ। গোঁড়ামি থাকা মানে হ'ল সঙ্কীর্ণতা।

এই সঙ্গে কিন্তু ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কাদিরী নামে এক ব্যক্তির প্রভাবে তিনি ইংরেজ বিরোধী হয়ে উঠলেন। তিনি

ভাবতে শুরু করলেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ করতে হবে। গঠন করলেন জমাইয়াৎ-উল-ইসলাম নামে একটি দল। যুবকদের জড়ো করতে লাগলেন নিজের পাশে। বোঝাতে লাগলেন নিজের উদ্দেশ্যের কথা।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়ার কর্তারা নজর রাখলে আহ্‌ম্মদের প্রতি। এ-তো ভাল কথা নয়। সারা উত্তর ভারতেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে। অযোধ্যার নবাবকে সরিয়ে দিয়ে রাজ্যটি দখল করে নিয়েছে ইংরেজ। এতে আগুন হয়ে আছে অযোধ্যা। সিপাহীরা তো অসন্তুষ্ট কোম্পানীর বিরুদ্ধে। এর উপর আবার ধর্মযুদ্ধের প্রচার সুরু হচ্ছে। এ সহ্য করা যাবে না। আহ্‌ম্মদ তখন ছিলেন আগ্রায়। সেখান থেকে তাঁকে বহিষ্কার করে দেওয়া হ'ল। আহ্‌ম্মদ এলেন লক্ষ্ণৌ—লক্ষ্ণৌ আবার অযোধ্যার রাজধানী। সরকারের বিপদ বৃদ্ধিই পেল। তিনি এখানে ধর্ম্মযুদ্ধের কথা প্রচার করতে লাগলেন। অযোধ্যা থেকেও বহিষ্কৃত হলেন আহ্‌ম্মদ, এলেন ফৈজাবাদে। আর না। ১৮৫৭ সাল। চারিদিকে বিদ্রোহের দামামা বাজতে শুরু করেছে। পুলিশ আহ্‌ম্মদকে জেনেশুনে ছেড়ে রাখতে পারে না। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হ'ল তাঁকে। দেওয়া হ'ল মৃত্যুদণ্ড।

শুরু হয়েছে মহাবিদ্রোহ। উত্তর প্রদেশে জ্বলছে সেই আগুন। বিদ্রোহীদের একটা দল জেল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল আহ্‌ম্মদ-উল্লাহকে, তাঁকে নিজেদের নেতা বলে বরণ করে নিল তারা। ফৈজাবাদের দায়িত্বে রাজা মানসিং নামে আর এক নেতাকে রেখে আহ্‌ম্মদ্ উল্লাহ এগোতে থাকলেন লক্ষ্ণৌর দিকে। পথে আটকালো তাঁকে ইংরেজ বাহিনী। কিন্তু পরাজিত হ'ল তারা। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই আহ্‌ম্মদ্-উল্লাহ লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি আক্রমণ করলেন। অযোধ্যায় যে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি থাকতেন তারই বাড়ী আর অফিস ছিল এই রেসিডেন্সি। রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য ইংরেজ তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। অযোধ্যার প্রধান কর্তা হেনরি লরেন্স স্বয়ং রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করলেন। কিন্তু তিনি আহত হন। এই আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। রেসিডেন্সির বাড়ীটি গোলার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। ৮৭ দিন ধরে রেসিডেন্সি অবরোধ করে রইলো বিদ্রোহীরা। আউটরাম এলেন আরও সেনা আর রসদপত্র নিয়ে। এবার আর শক্তিতে বিদ্রোহী সেনা পেরে উঠলো না, সরে গেল তারা। আলমবাগের যুদ্ধে আর কাইসারবাগের যুদ্ধে হার হল আহম্মদের। কিন্তু হার মানলেন না তিনি।

লক্ষ্ণৌতে পরাজিত হয়ে আহম্মদ্ উল্লাহ চলে আসেন রোহিলখণ্ডে। এই দেশের কিছু অঞ্চল তিনি ইংরেজ মুক্ত করেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁকে নেতা বলে মান্য করতে থাকে। 'খলিফাৎ উল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন তিনি আর নিজের নামে মুদ্রাও চালু করেন।

এদিকে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য জাল পাততে থাকে। কিছুতেই ধরা যায় না তাঁকে। ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে তাঁকে ধরিয়ে দিলে ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মানুষের দুর্বলতারই জয় হল। অর্থলোভী এক অনুচরই আহম্মদ্-উল্লার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দেয়। ১৮৫৮ সালের ১৫ই জুন ইংরেজ সরকারের গুলি আহম্মদ্-উল্লহাকে হত্যা করে।

ঝাঁসির রাণী

ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট মেয়েটি, নাম মনুবাই। আদর করে কেউ কেউ ডাকেন ছবেলী। যেমন লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত কোমলকান্তি, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ তেমনই তেজ। খেলাধূলো ছেলেদের সঙ্গে। ঘুড়ি ওড়াতে ভাল লাগে, চাকা চালানোও ভাল লাগে, আবার রাণী সাজতেও ভাল লাগে। ছেলে সঙ্গীরা পড়াশুনা করলে ওকেও পড়তে দিতে হবে। হাতি চড়া, ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার চালান সবই শিখে যায়, এই মেয়েটি যাঁর আরেক নাম লক্ষ্মীবাঈ। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ। যিনি মাথা উঁচু করে ইংরেজদের ওপর বলতে পেরেছিলেন "মেরী ঝাঁসি নেহী তুঙ্গী।" মনুর বাবা মোরেপন্থ বলবন্ত রাও তাম্বে স্বীয় প্রভু চিমনজী আপ্পার সঙ্গে কাশীতে চলে এসেছিলেন। চিমনজী ছিলেন মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের ভাই। এই বাজীরাও ইংরেজদের হাতে সব ক্ষমতা হারিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা বৃত্তি লাভ করেছিলেন, আর বিঠূরে থাকবার অনুমতি পেয়েছিলেন। কাশীতে মোরেপন্থ আপ্পাজীর দেওয়ানের কাজ করতেন। মোরেপন্থের স্ত্রী ভাগীরথী বাই ছিলেন পুণ্যবতী মহিলা। তাঁর কোলে মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৩৫ সালের নভেম্বর মাসে। ছোটবেলাতেই মাকে তিনি হারান।

আপ্পাজীর মৃত্যুর পর মোরেপন্থ বিঠূরে চ'লে যান। সেখানে বাজীরাও-এর বাড়ীর পাশেই ছিল তাঁর বাড়ী। এখানে মা-হারা মেয়েটি সকলের আদরে বড় হতে লাগলেন, বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানাসাহেব আর রাওসাহেবের সঙ্গে খেলাধূলো ও পড়াশুনো করতে লাগলেন। মনুর বিবাহ হ'ল মাত্র সাত আট বছর বয়সে ঝাঁসির বিপত্নীক মহারাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে। এখানেই তাঁকে লক্ষ্মীবাঈ নাম দেওয়া হ'ল। রাজগৃহে লক্ষ্মীবাঈয়ের নানা গুণ এবং তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পেতে লাগল।

কিন্তু আস্তে আস্তে দুর্ভাগ্য যেন তাঁকে ঘিরে ধরল। একটি পুত্র সন্তান জন্ম-

গ্রহণ করে মারা গেল। ১৮৫৩ সালে গঙ্গাধর রাও মারা গেলেন। দত্তক পুত্র ৫ বছরের দামোদর রাওকে কোলে করে রাণী দুঃখ ভুলতে চাইলেন। দুঃখ নিয়ে থাকলে তো চলবে না। রাজা তো তাঁকেই রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করে রাজ-শাসনের ভার দিয়ে গেছেন। নিজে অতি সরল সাধাসিধে জীবন কাটাতেন। সাধারণ ক'টি অলঙ্কার ছাড়া কিছুই ব্যবহার করতেন না। সাদা শাড়ী তাঁর প্রিয় ছিল। দেবপুজোর কাজে তাঁর সময় কিছুটা কাটত। মহালক্ষ্মীর মন্দিরে পুত্রকে নিয়ে তিনি প্রায়ই পূজো দিতে যেতেন। রাজবাড়ির আশ্রিত লোকদের সুখ-সুবিধের দিকে নজর রাখতেন। জ্ঞানী-গুণীর মর্যাদা দিতেন। এ সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং রাজ্য চালাতেন। দরবারে যাবার সময়ে তিনি প্রায়ই পুরুষের বেশে সজ্জিত হতেন। বুদ্ধিমতী রাণী নানা বিষয়ে নির্দেশ দিতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের কাজ দক্ষতার সঙ্গে চালাতেন।

কিন্তু এবার এক বিরাট বিপদ এসে উপস্থিত হ'ল। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ঠিক করেছিলেন যে তাদের আশ্রিত রাজ্যগুলির রাজাদের দত্তকপুত্র তাঁদের রাজ্যের অধিকারী হতে পারবে না। এই নীতি অনুযায়ী ঝাঁসি অধিকার করে নেবার ঘোষণা করা হ'ল এবং রাণীকেও বৃত্তি ও মান-মর্যাদা দেবার ঘোষণা করা হ'ল। রাণী কিন্তু বৃটিশ সরকারের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নই ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে সরকার বাহাদুরের ন্যায় বিচারই করবেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে লোকও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে কি করেছিলেন জানা যায় না। লর্ড ডালহৌসী রাণীর জন্য কয়েক হাজার টাকার বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দিলেন। ঝাঁসির কেল্লা ও রাজকোষ দখল করলেন। তাঁর পুরানো সমস্ত কর্মচারীকে বিদায় করে দেওয়া হ'ল যদিও তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিলেন "মেরী ঝাঁসি নেহী দুঙ্গী।" তবুও তাঁকে বৃত্তিভোগী হয়ে শহরের রাজবাড়ীতে সাধারণভাবে বাস করতে হ'ল। তাঁর দান ধ্যান বন্ধ হ'ল। ক্রমে দারিদ্র দেখা দিল। এমন কি ঝাঁসির কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে চারজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে জামিন রেখে সরকারী তহবিল থেকে টাকা এনে দামোদরের উপনয়ন অনুষ্ঠান করতে হ'ল।

এদিকে ১৮৫৭ সাল এসে গেছে। প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে মহাবিদ্রোহ শুরু হয়েছে। কৃষক, কারিগর, তালুকদার, ছোটখাট জমিদার রাজ্যহারা রাজা-রাজরা আর বিক্ষুব্ধ সিপাইরা উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরলেন। এই বিদ্রোহের ঢেউ ঝাঁসিতে এসে উপস্থিত হ'ল। ঝাঁসির সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয় এবং তারা প্রধান

সেনানায়ক ডানলপকে হত্যা করে। ঝাঁসির কমিশনার স্কিন ও অন্যান্যরা দুর্গ রক্ষণের ব্যবস্থা করতে শুরু করেন আর লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য লোক পাঠায়। কিন্তু বিদ্রোহীরা এই ব্যক্তিদের হত্যা করে। স্কিন সাহেব সন্ধি প্রার্থনা করলে কেল্লার দ্বার খুলে দিতে বলা হ'ল এবং তাদের প্রাণ রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হ'ল। কিন্তু কেল্লার দরজা খুলে দেওয়া হলে স্কিন ও সমস্ত লোকেদের হত্যা করা হ'ল। এসব ঘটনার সঙ্গে রাণীর সম্ভবত যোগ ছিল না। বরং এ ঘটনা ঘটার আগে গর্ডন সাহেবের প্রার্থনায় রাণী কিছুদিন ইউরোপীয় মহিলাদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যদিও তারা কয়েকদিন পরে কেল্লাতে ফিরে যায়। কেল্লাতে রাণী কিছুদিন খাদ্যও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা মনে করেছিল রাণী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারাও রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের আসল নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। রাণীর আত্মীয় সদাশিব রাও মহারাজা উপাধি গ্রহণ করলেন আর প্রতিবেশী বোর্ছা রাজ্যের দেওয়ান ঝাঁসির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অবশ্য নিজের বুদ্ধিগুণে এবং যুদ্ধ পরিচালনার গুণে দুই শত্রুই বিদায় হয়। কিন্তু নথে খাঁ ইংরেজদের কাছে রাণীর নামে অভিযোগ করে রাখলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ স্যার হিউরোজকে একদল সৈন্য দিয়ে ঝাঁসির দিকে পাঠিয়ে দিলেন। রাণী যখন দেখলেন যে ইংরেজদের কাছে সুবিবেচনার কোন আশাই নেই তখন আবার ঘোষণা করলেন "মেরী ঝাঁসি নেহী দুঙ্গী।" এবার আর ক্ষীণ কণ্ঠে নয়, বলিষ্ঠ কণ্ঠে। হিউরোজ ঝাঁসির কেল্লা দখল করার চেষ্টা করলেন, কারণ—ইতিমধ্যে রাণী কেল্লায় পুনরায় চলে এসেছেন। এবার হিউরোজের সঙ্গে যোগ দিলেন ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট। রাণী নিজের সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। নিজে সৈন্য-দলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন। কেল্লার ভাঙা অংশ সারিয়ে নেওয়া হ'ল। বারুদের ওপর তোপ বসান হ'ল। শহরের প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক প্রবেশ করিয়ে পাহারা বসান হ'ল। ১৮৫৮ সালের ২৩শে মার্চ যুদ্ধ শুরু হ'ল। কেল্লার ঘন গর্জ কামানের গোলায় ইংরেজ সৈন্য প্রথমে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ঝাঁসির সৈন্য সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সমানে লড়াই করলো। এদিকে আর এক বিদ্রোহী নেতা তাঁতিয়া তোপী কালপীর দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল। অবশ্য ইংরেজরা তাদের পরাজিত ক'রল। এদিকে এগারো দিন ঘোর যুদ্ধ করে ইংরেজ সৈন্য শহরের প্রাচীর ভেঙে শহরে প্রবেশ করতে শুরু করলো। উপায়ান্তর না দেখে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য ও ভবিষ্যতে আবার

যুদ্ধের জন্য রাণী কয়েকজন অনুচর ও সহচরীর সঙ্গে শহর ছেড়ে কালপীর দিকে চলে যাবার চেষ্টা করলেন। নিজের পিঠে বেঁধে নিলেন পুত্র দামোদর রাওকে। কালপীতে এসে তিনি নানাসাহেবের ভাই রাও সাহেবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাওসাহেব রাণীকে আর তাঁতিয়া তোপীকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন। অবশ্য রাণীর পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি বলে তিনি পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। পরে অংশগ্রহণ করলেও এই যুদ্ধে ইংরেজরাই জয়ী হয়। রাণী তাঁতিয়া তোপী ও রাওসাহেব গোয়ালিওরে এসে উপস্থিত হলেন, এখানেও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হ'ল। কিন্তু রাণীর সৈন্যেরা পরাজিত হ'ল। রাণী দামোদর রাও ও কয়েকজন বিশ্বাসী সর্দার ও পরিচারিকা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন। কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য পথে তাঁদের আক্রমণ করল। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে রাণী মাটিতে পড়ে গেলেন। রাণীর লোকজনেরা বাকী ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে আহত রাণীকে নিয়ে এলেন গঙ্গাদাম বাবাজীর কুটিরে। সেখানে দামোদর রাওয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন মূমুর্ষু রাণী। আস্তে আস্তে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল।

উলগুলান

ছোটনাগপুরের বনে ছাওয়া রাঁচি, পালমৌ প্রভৃতি জায়গায় বাস করতো শান্ত, সরল কোল জাতি। এদের শরীর ছিল যেন কালো পাথর কুঁদে তৈরী আর তেমনই কঠোর পরিশ্রমী ছিল এরা। বন জঙ্গল পরিষ্কার করে এঁরা বসিয়েছিল গ্রাম। এরা বলতো 'খুটকাট্টি' গ্রাম। এই গ্রামগুলি কোলদের সবার সম্পত্তি ছিল। যাকে বলে যৌথ সম্পত্তি। বনে জঙ্গলে ছিল এদের অবাধ চলাফেরা। বনের ওপর এদের অবাধ অধিকার ছিল। কোন জমিদার, কোন রাজা সেই অধিকার কেড়ে নেয় নি। এরা বন থেকে কাঠ, মধু সংগ্রহ করতো। বনের পশু ছিল এদের সঙ্গী-সাথী। গরু মহিষ, কুকুর এরা পালন করতো আবার অন্যান্য পশু পাখির মাংস এরা খেতো। জমিদারকে গ্রাম হিসাবে খাজনা দিতে হ'ত, প্রতি জনকে আলাদাভাবে খাজনা দিতে হত না। শস্য দিয়ে খাজনা দেওয়া হ'ত। গ্রামে থাকতেন একজন করে মোড়ল, মোড়লকে সকলে খুব মান্য করতো। কোলদের প্রধানকে বলা হতো 'মুণ্ডা'। ক্রমে কোলরা মুণ্ডা নামেই পরিচিত হয়ে গেল। কোলদের পুরোহিতকে বলা হ'ত 'পহান'। আর সব আদিম জাতির মত কোলরাও সারাদিন পরিশ্রম করে জমিতে ফসল ফলাতো। বনের কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করতো, পশু চরাতো আর সন্ধ্যায় মাদল, বাঁশি বাজিয়ে, নাচ, গান করে সময় কাটাতো। এদের নিজেদের দেবতা ছিলেন। তাঁর পুজো করা হ'ত। মহুয়ার ফল, হাঁড়িয়া প্রভৃতি খেয়ে এরা আনন্দে মেতে উঠতো।

কিন্তু ইংরেজরা এদের গ্রামগুলির দিকে নজর দিল। এই জায়গাগুলোও তো তাদের দখলে আনা চাই। সঙ্গে সঙ্গে এলো জমিদার, মহাজন আর ব্যবসায়ীর দল। এরা সকলেই সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতিদের কাছে 'দিকু' নামে পরিচিত ছিল। জমিদারেরা চড়া হারে খাজনা নিতে শুরু করলো। এর উপর আবার তাদের বাড়ীতে বেগার শ্রম দিতে হ'ত মুণ্ডা প্রজাদের। বেগার

কি জান তো? বিনা মজুরীতে কাজ করে দেওয়া। জমিদারের বাড়ীতে বিয়ে—যত কাজ তাদের করতে হবে। জমিদার যাবেন মহাল দেখতে, চলো পালকি বইতে হবে। কি সুন্দর ব্যবস্থা বলতো? মহাজনেরা চড়া সুদে গরীব মানুষদের ধার দিয়ে কিনে রাখতো। আর একটা ব্যাপার ঘটছিল এরই মধ্যে। খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেন যাঁরা অর্থাৎ খ্রীষ্টান মিশনারীরা এঁদের মধ্যে তাদের ধর্ম প্রচার করতে লাগলো। এই ধর্ম নিলে এদের স্কুলে লেখাপড়া শেখা যাবে, চাকরী পাওয়া যাবে, আরও নানা সুবিধে পাওয়া যাবে—এই আশায় অনেকে রাজার ধর্ম গ্রহণ করলো। লোভ দেখাল, চা বাগানে কুলির কাজ করলে পাওয়া যাবে মোটা মাইনে। সব দিক থেকে বেঁধে ফেলা হ'ল স্বাধীন মানুষগুলিকে।

একথা মনে কোরো না, কোলরা এইসব শান্ত মনে মেনে নিয়েছিল। বার বারই এরা প্রতিবাদ জানিয়েছে জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে। বীর সিং আর মাধো সিং এই রকম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। হো কৃষকরা পোড়ামাটির জমিদারের অত্যাচারে তীর, ধনুক, বর্শা, টাঙ্গি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষে ইংরেজ সৈন্যের কামান এনে জঙ্গলের উপর গোলা ফেলে তাদের থামাতে হয়। ইংরেজ সরকার ছোটনাগপুরকে শান্ত রাখার জন্য ব্যবস্থা করে। কিন্তু শোষণ আর অত্যাচার কমাবার কোন ব্যবস্থাই তারা করে না। বারবার আদিবাসীরা বিদ্রোহ করে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহেও দু'জন নেতাকে ফাঁসি দেয় ইংরেজ সরকার।

মুণ্ডারা এর পর জমির জন্য আন্দোলন সুরু করে। আদালতে গিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। জমি দাও, ছোটনাগপুর আমাদের। বেঠবেগারী বন্ধ করো। এর নাম সর্দার আন্দোলন। কিছুতেই কিছু হয় না। সিদো—কানহুর আন্দোলন হয়ে গেল; গভীর ছাপ পড়লো মুণ্ডাদের মনে। কে আসবে আমাদের মুক্তির কথা শোনাতে? কোথায় সেই 'ধরতী আবা'।
হ্যাঁ। 'ধরতী আবা' এলেন কামবা গ্রামের সুগানার স্ত্রী করমির কোলে। ১৮৭৪ বা ১৮৭৫ সালে তাঁর জন্ম। বৃহস্পতিবারে জন্মালেন তাই আদর করে নাম দেওয়া হ'ল বীরসা। কে জানত এই বীরসা জ্বেলে দেবে নতুন আলো। শুধু কোল মুণ্ডার মনে নয়, সারা দেশের মনে।

চুটিয়া পূর্তি গোত্রের এই পরিবারের বেশীর ভাগ মানুষই ছিলেন খ্রীষ্টান। এই সব আদিবাসীদের বেশীর ভাগই চাকরি, জমি পাওয়ার আশায় খ্রীষ্টান

হয়েছিলেন। অবশ্য ভুল বুঝতে দেরী হয়নি। এখন অনেকেই পুরানো মুণ্ডা ধর্মে ফিরে এসেছিলেন। সুগামাও ফিরে এসেছিলেন আদিম মুণ্ডা ধর্মে। যাই হোক্, ছোট্ট বীরসা সকলের আদরের! কালো ছেলেটি ছাগল চরিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে বাঁশি আর টুইনা বাজিয়ে সময় কাটায়, পড়াশুনার ইচ্ছে মনে প্রাণে। পাঠানো হ'ল কাছেই এক জার্মান মিশনারীদের স্কুলে। সেখানে লোয়ার প্রাইমারী পাশ করে বীরসা গেলেন চাঁইবাসার আপার প্রাইমারী স্কুলে পড়তে। মিশনের সাহেব একদিন কথায় কথায় মুণ্ডাদের বললেন জোচ্চোর। আর যায় কোথায়। ঐ শান্ত ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালো। অনেকদিন পরে আর একজন মহান মানুষ এই রকম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কলেজে সাহেব অধ্যাপকের অপমানজনক উক্তির। কে জানো? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

আর তো পড়া হ'ল না স্কুলে; না-ই-বা হ'ল। যে জানতে চায় সে যে ভাবেই হোক জানতে পারে। বন্দগাঁও-এ চাকরী করতে এসে মুন্শী আনন্দ পাঁড়ের কাছে বীরসা শোনেন নানা ধর্মমতের কথা। বৈষ্ণব ধর্মের দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট হ'ল। আর বুঝলেন তিনি মুণ্ডাদের ধর্মকে জোরদার করতে হবে। হিন্দু, খ্রীষ্টান কেউ-ই মুণ্ডাদের বন্ধু নয়। সিদো-কানহুর মত ধর্মের নামে মুণ্ডাদের একজোট করতে হবে। তারপর শুরু হবে জমির লড়াই। আর মুণ্ডাদের পথ দেখাতে হবে তাঁকেই।

বীরসা প্রচার করতে লাগলেন ভগবান সিং বোঙা তাঁকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন এক দেবতার পুজো কর, আর নিজেরাই পুজো কর। সৎ জীবন কাটাও। মদ মাংস খাওয়া ছেড়ে দাও। গলায় পবিত্র সূত্র পর, যাকে বলা হয় 'জানে'। মুণ্ডা যুবকেরা দলে দলে বীরসার দলে যোগ দিল। তারা 'বীরসাইত' হ'ল। বীরসা থাকতেন চালকাদ গ্রামে। চালকাদ যেন মুণ্ডাদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠলো। এবার বীরসা প্রচার করতে থাকেন দিকুদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা, ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা।

ইংরেজ শাসকের ঘুম ভেঙে গেল। সিংভূমের ডেপুটি কমিশনার বীরসাকে গ্রেপ্তার করতে গেল প্রচুর পুলিশ আর লোকজন নিয়ে। কিন্তু তাড়া খেয়ে ফিরে এল তারা। এর পর বীরসা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। ইংরেজের পুলিশ তাঁর পিছনে। কখনও মুখোমুখি লড়াই হয়। কখনও তিনি লুকিয়ে থাকেন মুণ্ডাদের ঘরে। হাতি এনে গ্রামের ঘর-বাড়ি ভেঙে দেয় পুলিশ। এইভাবে একদিন ঘুমন্ত বীরসাকে ধরে ফেলে তারা। বিচারের জন্য পাঠান হয়

রাঁচি। বিচার চলার সময় আদালতে মুণ্ডাদের সে কি ভিড়! জমিদারের কাজে যাবে না কেউ। আড়াই বছর সশ্রম জেল হ'ল বীরসার।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে বীরসা দল গড়ার কাজে নামলেন। ডোমনা মানকির বাড়িতে সভা হ'ল। তিনি বোঝালেন যে তাঁদের ধর্ম আর রাজনীতি এক। চারিদিকে সভা হতে লাগলো। ডোমবারি পাহাড়ের সভায় একটা লাল নিশান সাজানো কলাগাছ রাখা হ'ল—ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক হিসাবে। মুণ্ডারাজের প্রতীক সাদা নিশান। বীরসা তীর মেরে কলাগাছে আগুন জ্বেলে দিলেন। সাদা নিশান তুলে ধরলেন। শুরু হ'ল উলগুলান—বিদ্রোহ। মুণ্ডারাজের জয় হোক। রাজা, জমিদার, হাকিম, পুলিশ, পুরোহিত, পাদ্রী সকলকে হত্যা করা হবে—এরা সকলেই মুণ্ডাদের শত্রু। ১৮৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর একসঙ্গে চক্রধরপুর, খুঁটি, কারা, তামাড়, বাসিয়া, তোরপায় কুঠি কাছারী, আদালত, গীর্জা আর মন্দিরে উলগুলানের আগুন জ্বলে উঠলো। ভয়ে জমিদারের দল রাঁচি শহরে আশ্রয় নিল। রাঁচির ডেপুটি কমিশনার স্ট্রীটফিলড্ বীরসার সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাল। যাদের বীরসার লোক বলে সন্দেহ করা হ'ল তাদের উপর অত্যাচার চালানো হ'ল। খুঁটি থানায় আগুন দিলে কয়েকজন কনস্টেবল হতাহত হ'ল। এরপর স্ট্রীটফিলড্ সৈন্য আনালেন খুঁটিতে। বীরসার দল সৈল বাকারের পাহাড়ে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বলোয়া নিয়ে তৈরী হ'ল ইংরেজের সৈন্যের মোকাবিলা করতে। কিন্তু বন্দুকের গুলির কাছে এই পুরানো হাতিয়ার কি করতে পারে। বহু মুণ্ডা নর-নারী সেদিন নিহত হ'ল। বীরসা সকলকে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে আদেশ দিলেন। সৈন্যরা জঙ্গল ঘিরে ফেললো। বিদ্রোহীরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বীরসার মাথার দাম ধরা হ'ল মাত্র ৫০০ টাকা। আর ঐ টাকার লোভেই বীরসারই দলের লোক তাঁকে ধরিয়ে দিলে। সেনত্রার জঙ্গল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

গ্রেপ্তার করে তাঁকে আনা হ'ল বন্দগাঁও-এ। সেখান থেকে রাঁচি। যেখানে বীরসা সেখানেই মুণ্ডা। দলে দলে তারা ভয় ভুলে ছুটে আসে বীরসা ভগবানকে দেখতে। এত অত্যাচার করা হ'ল। এত ঘর ভেঙে দেওয়া হ'ল। তবু ভয় নেই। গ্রেপ্তার করা হ'ল বহু লোককে। শেকলে বেঁধে ফেলে রাখা হ'ল প্রায় ৫৮০ জনকে। বীরসাকেও এক নির্জন ঘরে শেকলে বেঁধে ফেলে রাখা হল। ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ধরা পড়েন বীরসা। আর ৯ই

জুন জানানো হল বীরসা মারা গেছেন কলেরায়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তাহলে চিকিৎসাও তো হয়নি। কেননা মৃত্যুর সময়েও তাঁর হাতে পায়ে শেকল পরানো ছিল। মৃত বীরসাকেও ভয় পেয়েছিল ইংরেজ সরকার। রাতের অন্ধকারে এক নালার ধারে পুড়িয়ে দিল তারা বীরসার দেহ—কবরও দিল না মুণ্ডারীতি অনুযায়ী।

বীরসার ছাই কোলহানের জমিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল তাঁরই দেশের এক মেয়ে। বীরসা বেঁচে আছেন মুণ্ডাদের হৃদয়ে, বীরসা বেঁচে থাকবেন ভারতবাসীর হৃদয়ে।

তিনি নিরুৎসাহ হলেন না। আবার কয়েক মাসের মধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরেজ পুলিশের ওপর। কিন্তু তাঁর এক প্রধান সহকারী গান মল্লু ডোরা পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেলেন। ইংরেজরা ঘোষণা করে যে সীতারামকে ধরিয়ে দিলে ১৫,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। গ্রামবাসীরা গরীব ছিলেন কিন্তু সীতারামকে ধরিয়ে দিয়ে ঐ টাকা নেবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। তাঁরা নানাভাবে সীতারামকে সাহায্যই করতো।

ইংরেজরা সীতারামের বিদ্রোহ থামাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠলেন। রাইফেল বাহিনীকে আনানো হ'ল। এদের সঙ্গে এল মেশিনগান, লিউটস্‌গান। বুঝতেই পারছো কি ভীষণ কাণ্ড বাঁধিয়েছিলো সীতারামের দল কয়েকটা বন্দুক নিয়ে। যাই হোক, কমিশনার রাদারফোর্ড সাহেব কড়া হাতে সীতারামকে দমন করবার চেষ্টা শুরু করলেন।

অবশেষে ১৯২৪ সালের ৬ই মে অঙ্গিরাজু নামে এক নেতা আর তার একদল অনুচর ধরা পড়লো ইংরেজদের হাতে। আর পরাজিত সীতারামও ধরা পড়ে গেলেন। কয়ূরে এনে বন্দী অবস্থায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হ'ল। মৃত্যুর আগেও তিনি পালাবার চেষ্টা করেছিলেন ; যদিও জানতেন যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। আদিবাসীদের আরো কয়েকজন নেতাকে গুলি করে মারা হ'ল। এঁদের মধ্যে ছিলেন গণ্ডাম, কোরা প্রভৃতি। অনেককে আন্দামানে পাঠানো হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে। এদের মধ্যে ছিলেন বণাঙ্গি পাণ্ড পরাল।

বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে

দুর্ভিক্ষের ভয়ানক ধাক্কায় মহারাষ্ট্র কাঁপছে। গ্রামগুলো অনাহারে প্রাণহীন। মানুষের দুঃখের যেন শেষ নেই। গ্রামের পর গ্রামে শস্যের ক্ষেত শুধুই ধূ-ধূ করছে। খাদ্য নেই, আর শহরেও তাই হাহাকার। এরই মধ্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন এক পথিক। ক্লান্ত, শ্রান্ত তাঁর শরীর। দুঃখে চিন্তায় ম্লান তাঁর মুখ।

না, তিনি সেই সরকারী কর্মচারী নন যাঁকে ত্রাণ কাজের জন্য ইংরেজ সরকার পাঠিয়েছেন, এই ইন্দোর, নাগপুর, খান্দেশ, নাসিক, কোলহাপুর শহরে বা আশেপাশের গ্রামে। তিনি কোন দাতব্য সমিতিরও কেউ নন। তিনি অগণিত ভারতবাসীরই একজন। এই মহারাষ্ট্রেরই এক স্বচ্ছল অবস্থার চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। মহারাষ্ট্রের সামরিক অর্থ দপ্তরের একজন কর্মী তিনি। নাম বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে।

কেন হাঁটছেন তিনি? কোথায় চলেছেন? তিনি দেখতে চলেছেন নিজের চোখে তাঁর দেশবাসীর দুরবস্থা। নিজের চোখে দেখতে চলেছেন সেই দেশবাসীদের, যারা দুঃখে, দুর্দশায়, কষ্টে জরজর কিন্তু পড়ে পড়ে মার খায়। তিনি দেখলেন তাঁদের কষ্ট। শুনলেন তাঁদের কথা, বুঝলেন এই দুর্ভিক্ষের জন্য সরকার দায়ী। সরকারী সাহায্য পাঠানো হচ্ছে বটে কিন্তু এত কম যে তাতে হাসিই পায়। যা ছিল তাঁর কাছে সব উজাড় করে দিলেন। সে তো সামান্য। তবু সেটুকু দিয়ে যা তিনি নিয়ে এলেন সেটাই হল জমা তাঁর মনে।

কি তিনি করবেন ঠিক করলেন আর কি তিনি করলেন সে সব জানবার আগে চলো ফিরে দেখে আসি তাঁর ছেলেবেলাটা। মহারাষ্ট্র তাঁর দেশ ছিল, সে তো আগেই শুনেছ। সেই মহারাষ্ট্র, যার মাটিতে একদিন জন্মেছিলেন বীর শিবাজী। যে চিৎপাবন বংশে তিনি জন্মেছিলেন সেই চিৎপাবনরা বুদ্ধির জন্য

আল্লুরি সীতারাম রাজু

অন্ধ্রের গোদাবরী জেলার রুম্পা অঞ্চলে ওখানকার আদিবাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো। ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের সব কাজেই বাধা দিত। চাষ-বাস, পশুপালন, বনের কাঠ সংগ্রহ করা—সব বিষয়েই তারা পদে পদে বাধা পেতো। তার ওপর জোর করে তাদের বেগার খাটানো হ'ত। কারো কাছে কোনো প্রতিবাদ করার ছিল না। কে তাদের কথা শোনে ?

১৮৭৩ সালে যে ভয়ানক অজন্মা হয় তার ফলে দাক্ষিণাত্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা গেল। রুম্পার আদিবাসীদের কষ্টের অবধি ছিল না। এই কষ্ট সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার এদের ওপর নানা বাধা-নিষেধ জারী করে। এত অসহ্য হয়ে যায় সবকিছু যে এই শান্ত মানুষগুলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এদের নেতা ছিলেন চান্দ্রিয়া, যুমন ধোরা, লিঙ্গম রেড্ডি ও অন্যান্যরা। অসম সাহসী রুম্পার বিদ্রোহীরা চান্দ্রিয়ার মৃত্যুতে পরাজিত হয়।

১৮৯৭ সালে রুম্পায় জন্মালেন আল্লুরি সীতারাম রাজু। ইনি রুম্পার মানুষদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন।

সীতারাম রাজুর বাবার নাম বেঙ্কটরাম রাজু আর মা ছিলেন সূর্যনারায়ণ আম্মা। বেঙ্কটরাজ গোদাবরী জেলার মোগাল্লু গ্রামে বাস করতেন। তিনি ছিলেন এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্ষত্রিয়। ছেলের লেখাপড়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। সীতারাম পড়াশুনাতে ভালই ছিলেন, তবে ঘোড়ায় চড়া, জ্যোতিষ আর ওষুধের গাছগাছড়া চেনার কাজেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশী !

যত বড় হতে থাকলেন সীতারাম ততই সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়লেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করে যোগ অভ্যাস করতে লাগলেন। বিশাখাপত্তনম আর গোদাবরী জেলার পার্বত্য আদিবাসীদের মধ্যেই তিনি ঘুরে

বেড়াতেন আর তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করলো।

গান্ধীজী তার অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে যে ডাক দিয়েছিলেন, সীতারাম রাজুর কানেও সে ডাক পৌঁছালো। তিনিও ভাবতে শুরু করলেন সব রকম অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তার আগে মানুষকে তৈরী করা চাই। আদিবাসীদের মদের নেশা দূর করার জন্য তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। সফলও হলেন কিছু পরিমাণে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করলেন। আদিবাসীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর কাজ ইংরেজ পুলিশের পছন্দ হ'ল না। তারা নজর রাখতে শুরু করলো সীতারামের উপর। সীতারাম নিশ্চয়ই সরল লোকগুলিকে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

সত্যিই কিন্তু সীতারাম ভাবিয়ে তুললেন। তিনি স্বাধীনতার কথা ভাবতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন আদিবাসীদের দুঃখ দুর্দশার কথা ঢের জানানো হয়েছে ইংরেজদের কাছে। এর আগে বিদ্রোহও হয়েছে। কিন্তু কিছু লাভই হয়নি। ইংরেজরা সহজে কোন অধিকার দেবে না। অহিংস আন্দোলন করে কোন লাভ নেই। তাঁর মধ্যে যেন বিদ্রোহীর তেজ জ্বলে উঠেছিলো। তিনি ঠিক করলেন আদিবাসীদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করবেন।

সীতারাম আদিবাসীদের বোঝাতে লাগলেন। তাদের দুঃখকষ্টের কথা তাদের বোঝালেন। বোঝালেন যে জোর করে বিদেশী ইংরেজরা তাদের ওপর জুলুম চালাচ্ছে। অতএব জোর করেই নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে হবে। প্রায় ৩০০ কৃষক ও তরুণ নিয়ে তাঁর বাহিনী তৈরী হ'ল। একের পর এক থানা আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করতে লাগলো এই বাহিনী।

১৯২২ সালে সীতারাম আর তাঁর সহযোগিরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলেন। প্রথমেই চিন্তাপল্লীর থানা আক্রমণ করে মজুত বন্দুক, গুলি প্রভৃতি দখল করে নেওয়া হ'ল। এর পর বেশ কয়েকটা থানা আক্রমণ করা হ'ল। পুলিশের মুখোমুখি লড়াই-এ পুলিশই হেরে গেল। ইংরেজ সরকার দেখলেন যে গোদাবরী জেলার পুলিশ দিয়ে সীতারামকে থামানো যাবে না। মালাবার জেল থেকে এক পুলিশ বাহিনী আনা হ'ল। কিন্তু সীতারাম একের পর এক জায়গায় তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকেন। কিন্তু এরপর দু' জায়গায় পুলিশের হাতে তাঁর পরাজয় হওয়ায় তাঁর শক্তি কমে যায়। অবশ্য

বেশ বিখ্যাত ছিলেন। নানা ফড়নবীশ একজন চিৎপাবন ছিলেন। ফড়নবীশ নিজের বুদ্ধি দিয়ে মারাঠা রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। সেই তেজ আর দৃঢ়তা নিয়েই যেন জন্মালেন সেই বাসুদের বলবন্ত ফাদকে কোলাবা জেলার সিরধো গ্রামের এক স্বচ্ছল পরিবারে ১৮৪৫ সালে। বাড়ীর লোকজনেরা, মা, বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। খুব ধার্মিক তাঁরা। বাসুদেবেরও ছোটবেলা থেকে ধর্মে মতি। স্কুলে পড়তে পড়তেই তো বাড়ী থেকে চলে গিয়ে সন্ন্যাস নেবেন ঠিক করে ফেললেন। অবশ্যই মতটা বদলে গিয়েছিল। কল্যাণের এক প্রাথমিক স্কুলে তাঁর পড়াশুনা শুরু হ'ল। আর পড়তে পড়তেই মনস্থির হয়ে গেল, ইংরেজী পড়তে হবে। কিন্তু অত গোঁড়া বাবা কি মত দেবেন? ঠিক আছে জানাবোই না বাবাকে। লুকিয়ে লুকিয়ে মিশনারীদের ইংরেজী স্কুলে গিয়ে খানিক ইংরেজী শেখা হয়ে গেল। প্রাথমিক পাঠ শেষ হবার পর বাবাকে বলে তার মত নিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হয়ে তবে ছাড়লো ছেলে। খুব উৎসাহ পড়ায়। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না। পরীক্ষা না দিলেও ইংরেজীতে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাতে মেলাই সরকারী চাকরী জুটে যাবে। হলও তাই, একটার পর একটা চাকরী ধরেন আর ছাড়েন, শেষে মিলিটারীর হিসেব দপ্তরে মন বসল।

এদিকে বিয়ে হয়ে গেছে দু'বার। প্রথম বিয়ে ১৪ বছর বয়সে। সেই স্ত্রীটি মারা গেলেন একটি মেয়ে রেখে। তাঁর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বিয়ে।

কিন্তু বড় সংসার যাঁকে ডাক দিয়েছে ছোট সংসার কি তাঁকে ধরে রাখতে পারে। বাবা যখন খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের খবর এগারো বারো বছরের বালককে, তখন খবরগুলি কি মনে দাগ রেখে যেত না?

১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যের বেশ কয়েক জায়গায় কৃষকরা মরীয়া হয়ে জোট বেঁধে বেশ কিছু মহাজন আর জমিদারদের বাড়ী থেকে দলিল-দস্তাবেজ আর বন্ধকী তমলুক বের করে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এইসব ঘটনা বাসুদেবের মনকে নাড়া দিয়েছিল। এই কারণেই তিনি ১৮৭৬-৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। আর ফিরে এলেন পীড়িত হৃদয় নিয়ে।

কিন্তু মন খারাপ করে রাখলে তো চলবে না। এর প্রতিকার চাই। যে ইংরেজ শোষণ করে এই হাল করেছে ভারতের তাদের রুখতে হবে। তাড়াতে হবে এদেশ থেকে। আর সাউকার, মহাজন, জমিদার যারা ইংরেজদের তাঁবেদার তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে গরীব মানুষগুলোর বন্ধকী দলিল, হুণ্ডি

আর হ্যাণ্ডনোটগুলো। কারো কাছে আবেদন দরখাস্ত করা নয়। যার যা আছে লাঠিসোঁটা নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সেনাদল। যত কমই শক্তি হোক, তবু দাঁড়াতে হবে মাথা তুলে।
বাসুদেব দল গড়লেন রামোসী উপজাতির যুবকদের নিয়ে, যেমন করে শিবাজী মাওয়ালী তরুণদের নিয়ে দল গড়েছিলেন। শুধু রামোসীদেরই তিনি পেলেন তা নয়, তাঁর আহ্বানে ভীল, কোল এমন কি কিছু রোহিলাও এগিয়ে এলেন। ২০০ আদিবাসীর এক সমাবেশ হ'ল ১৮৭৯ সালের গোড়ার দিকে। তাঁদের কাছে নিজের উদ্দেশ্যের কথা জানালেন বাসুদেব। সাড়া পেলেন তাদের কাছ থেকে। লাঠি, বর্শা, তরোয়াল আর কয়েকটা বন্দুক হ'ল তাদের হাতিয়ার। তাঁরা ঠিক করলেন সাউকারদের বাড়ীগুলো আগে লুট করতে হবে। টাকা, গহনা, বন্দুক পিস্তল আর দলিলগুলো চাই। দলিলগুলো জড়ো করে আগুন লাগিয়ে শেষ করে দিতে হবে। তাহলে সাউকারদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে। ওরা আর কিসের জোরে ধার শোধ চাইবে ধার নিয়েছে যে মানুষগুলো তাদের কাছ থেকে ?
যে কথা সেই কাজ। শুরু হল সংগ্রাম। লোনি, পুনে, কোণ্ডনপুর, শোলাপুর, শাহাবাদ—প্রায় ১০০টি গ্রামে বাসুদেবের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। যেখানেই সম্ভব হ'ল সাউকার আর বানিয়াদের বাড়ী লুট হ'ল। টাকা পয়সা লাগতো দলের কাজে আর দলিল পুড়িয়ে বাঁচানো হ'ত কৃষকদের। এত ভাল সংগঠন ছিল যে কে এর নেতা তা সরকার অনেকদিন জানতে পারে নি। অথচ নেতাটি গরীবের ভগবান হয়ে উঠেছেন।

এর পর বাসুদেব সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তিনি লাট সাহেবকে আর অন্যান্য বড় সরকারী কর্মচারীদের কাছে ডাকে খবর পাঠালেন যে যদি ট্যাক্স কমানো না হয়, যদি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে ভারতীয় মহাজনদের প্রতি যে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি, সেই ব্যবস্থা ইংরেজদের প্রতিও নেওয়া হবে। আর ঐ সব টাকা দিয়ে দল তৈরী করে আমরা আরও একটা বিদ্রোহ করব।
বলতে গেলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ঘোষণা করলেন বাসুদেব। তিনি জানতেন ভারতের এই দুরবস্থা, এই অত্যাচার—এসবের মূলে হ'ল পরাধীনতা। আর ইংরেজ তার শৃঙ্খলে জড়িয়ে রেখেছে ভারতকে। ঐ শৃঙ্খল ভাঙতে হবেই। না হলে মুক্তি আসবে না। এও জানতেন বাসুদেব মহাজনদের ওপর এই আক্রমণ সহ্য করবে না ইংরেজ। তাই তিনি অনুচরদের

নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ইংরেজদের মোকাবিলা করবার। তিনি কি নিজেই জানতেন না যে এ যুদ্ধ সমানে সমানে হবে না। ইংরেজদের আছে বাহুবল, অস্ত্রবল, অর্থবল আর তাঁর আছে কয়েকজন অসমসাহসী যুবক। কিছু পুরানো হাতিয়ার আর আছে দেশপ্রেম। তিনি আর তাঁর দল জানতেন মৃত্যু আছে শিয়রে দাঁড়িয়ে। তবু জীবন মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললেন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

ইংরেজ সরকার একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন ফাদ্‌কেকে পরাস্ত করতে। কোথায় ফাদ্‌কে? তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করা হ'ল ৪০০০ টাকা। ৪০০০ টাকা দেওয়া হবে তাকে যে ফাদ্‌কেকে ধরিয়ে দেবে। এদিকে ফাদ্‌কে নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, যে বোম্বাই-র গভর্ণর রিচার্ড টেম্পলকে হত্যা করতে পারবে তাকে দেওয়া হবে ৫০০ টাকা পুরস্কার। মহারাষ্ট্রের পাহাড়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করে ফাদ্‌কের দল ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু এই অসম যুদ্ধ তো বেশীদিন চলতে পারে না। তবুও গ্রামের মানুষেরা তাদের সাহায্য করে চলেন। ফাদ্‌কেকে ধরিয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারে না কেউ। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই কয়েকজন নেতা আর কৃষক সর্দার হরি নায়েক হলেন গ্রেপ্তার আর তার মৃত্যুদণ্ড হ'ল। ১৮৭৯ সালের ২০শে জুলাই ফাদ্‌কেও ধরা পড়লেন ইংরেজ সৈন্যের হাতে। বিজাপুর জেলার এক বৌদ্ধ বিহারে তিনি আশ্রয় নিতে এসেছিলেন অনেক পরিশ্রমের পর। প্রাণপণ লড়াই করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না।

এরপর তাঁর বিচার। বোম্বাইর গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন রাজদ্রোহের অপরাধে ফাদ্‌কেকে ফাঁসি দেওয়া হোক। কিন্তু আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল তাঁকে। যখন রায় বেরোনোর পর তাঁকে কোর্ট থেকে নিয়ে আসা হল তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা দিল আদালতের প্রাঙ্গণে। মানুষ ছুটে এসেছেন চোখের দেখা দেখতে তাঁদের বীর সন্তানকে; মুক্তির অগ্রদূতকে। আর শোনা গেল এক অভূতপূর্ব ধ্বনি—'বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কে কি জয়'। বোম্বাই হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায়-ই বহাল রাখলেন।

কিন্তু আন্দামানে তাঁকে পাঠান হ'ল না। অনেক দূরে নির্জন এডেন জেলেই পাঠান হ'ল এই বিপজ্জনক আসামীকে। কিন্তু সেখানেও একদিন তিনি জেল থেকে পালিয়ে বেরিয়ে এলেন উন্মুক্ত পৃথিবীতে। কিন্তু এই অচেনা জায়গায়

কোথায় যাবেন তিনি, আবার পড়লেন ধরা। পায়ের বেড়ী আরও মজবুত করে দেওয়া হ'ল।

কারাগারের নির্জনতায় কঠোর পরিশ্রমে ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগলো। তাঁর লোহার মত শক্ত শরীর আক্রান্ত হল যক্ষ্মারোগে। তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কে ? আস্তে আস্তে জীবনদীপ নিভে আসে। সেই কর্মমুখর দিনগুলির কথা মনে ভিড় করে আসে। চারিদিকে লোক পাঠানো হয়েছে। তাঁর স্বপ্ন একদিন একসঙ্গে ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে জেগে উঠবে। একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হবে। তার পর স্বাধীন ভারতে প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠবে।

১৮৮৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী মৃত্যু হ'ল এই বীর দেশপ্রেমিকের। কিন্তু প্রাণ দিয়ে তিনি পথ তৈরী করে দিয়ে গেলেন। তিনিই প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের। আর স্বপ্ন দেখেই থেমে যান নি। তাঁর স্বপ্নের দেশকে গড়ে তুলতে মরণপণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

একশ বছরেরও আগে একদিন বোম্বাই-র এক আদালত প্রাঙ্গণে সেই যে ধ্বনি জেগেছিল তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও সকলে বলি, বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কের জয়।

চাপেকার ভাইয়েরা

চাপেকারদের তিন ভাই-ই ছিলেন খুব দুঃসাহসী। মারাঠা চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশের বুদ্ধি আর তেজের কথা সকলেই জানতো। চিৎপাবন বংশীয় নানা ফড়নবীশ নিজের বুদ্ধিবলে মারাঠা রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সেই বংশেরই তো ছেলে এঁরা। এঁরা তিনভাই। দামোদর, বালকৃষ্ণ আর বাসুদেবের নাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে আগুন দিয়ে লেখা আছে, থাকবে।

চাপেকারদের এই পরিবারটি কোঙ্কণ থেকে পুনায় চলে আসে। বাবা হরিপন্ত ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পুরোহিত। পুরোহিতের কাজ করে আর কথকতা কীর্তন করে তিনি সংসার চালাতেন। পরিবারের সকলেই ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। পূজা-আর্চাতেই এঁদের দিন কাটতো। হিন্দুদের নানা আচার-আচরণ পালন করে দিন কাটাতেই এঁরা ভালবাসতেন। দামোদরের জন্ম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, বালকৃষ্ণের ১৮৭৩। আর বাসুদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। স্কুল-কলেজের লেখাপড়া এঁরা বিশেষ জানতেন না। সাধারণ লেখাপড়া করেই এঁরা বাবাকে তাঁর কাজে সাহায্য করতে থাকেন।

কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে তখন শুধু মারাঠাদেশের কেন প্রায় সারা ভারতেরই মানুষ অসন্তুষ্ট। এদের আর কত সহ্য করা যায়। এমন কি এদের ভাল কাজকেও সন্দেহের চোখে দেখা হ'ত। লোকমান্য তিলক যুবকদের একত্র করার জন্য গণপতি মেলা, শিবাজী উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করলেন। 'কেশরী' পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ লিখে যুবকদের উৎসাহিত করলেন। পুনাতেও সমিতি গড়ে উঠলো। ছেলেরা সেখানে ব্যায়াম, লাঠি খেলা শিখতে লাগলো। নিজেদের মধ্যে নানা আলোচনা করতে লাগলো। দামোদর আর বালকৃষ্ণও যোগ দিলেন ঐ সব দলে।

এদিকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ রোগ ভয়ানকভাবে ছড়িয়ে পড়লো বোম্বে

প্রেসিডেন্সিতে। এই রোগ বড় ভীষণ রোগ আর ছোঁয়াচে। লোকে এই রোগের চিকিৎসাও জানতো না। কি করা দরকার, কি করে ছোঁয়া বাঁচানো যায়, কিছুই বুঝতো না। তখন ইংরেজ সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হল রোগ প্রতিরোধের। সরকার এই বিষয়ে কাজ করার জন্য বড় বড় অফিসার নিয়োগ করলেন। র‍্যাণ্ড হ'ল পুনার স্পেশাল প্লেগ কমিশনার তার সহকারী আয়ার্স্ট, ১৮৯৭ সালে। এরা খুব উৎসাহের সঙ্গে রোগীদের হাসপাতালে পাঠানো, আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করলো। বাড়ী, রাস্তা ইত্যাদি বীজাণুমুক্ত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু এদের অতি উৎসাহের ফলে মানুষের দুঃখের সীমা রইল না। এরা সেনাদলকে দিয়ে খোঁজ করাতে লাগলো কোথায় কোন রোগী আছে। এরা লোকের বাড়ীতে বীজাণুমুক্ত করার নামে জিনিস-পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো, অকথ্য ব্যবহার করতে লাগলো ছেলে-বুড়ো সকলের সঙ্গে। এমন কি মেয়েদের অপমান করা হ'ল। সব কিছু অসহ্য হয়ে পড়লো লোকজনের কাছে। তিলক তাঁর পত্রিকা 'কেশরী' তে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে লাগলেন। অন্যান্য কাগজও চুপ করে রইল না। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে, থামাতে হবে এই অত্যাচার। প্রতিশোধ নেবো আমরা।

হ্যাঁ প্রতিশোধ নেবো। আমাদের ওপর অত্যাচারের অপমানের প্রতিশোধ নেবো। দামোদর আর বালকৃষ্ণ শপথ নিলেন—প্রতিশোধ নেবো। তাঁদের সহকর্মিরাও শপথ নিলেন। ঐ যে র‍্যাণ্ড একদিকে রোগ কমাবার নাম করে মানুষ মারছে আর অন্যদিকে আমোদে দিন কাটাচ্ছে—ওকে দেবো সরিয়ে চিরকালের জন্যে। তাহলে একটা শিক্ষা দেওয়া যাবে।

র‍্যাণ্ডের দিন শেষ হয়ে আসছে। দামোদর আর বালকৃষ্ণ সন্তর্পণে লক্ষ্য রাখছেন তার গতিবিধির ওপরে। কোথায় কখন থাকবে র‍্যাণ্ড—এসব তন্নতন্ন করে খোঁজ নিলেন। পিস্তলও যোগাড় হয়ে গেল। ঠিক হ'ল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যলাভের রজত-জয়ন্তীর উৎসবের শেষ করে র‍্যাণ্ড যখন 'গভর্নমেণ্ট হাউস' থেকে নিজের বাড়ীতে ফিরবে, তখনই তাকে আক্রমণ করা হবে। এই উৎসবের জন্য সরকারী বাড়ী সাজানো হয়েছে, বাজী পুড়ছে, কত লোক জড়ো হয়েছে। এই তো সুযোগ।

তারপর এক এক করে গাড়ি বেরিয়ে এলো গভর্নমেণ্ট হাউস থেকে। খানা-পিনা, নাচ-গান একসময় শেষ হ'ল। ঐ তো র‍্যাণ্ডের ঘোড়ার গাড়ী। নির্দিষ্ট জায়গাটায় আসতেই দামোদর পিছনের আসনে উঠে পড়লেন, আর সোজা

র‍্যাণ্ড-কে গুলি করলেন। বালকৃষ্ণও একসঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়েছেন, তিনি ঘায়েল করলেন আয়ার্স্টকে। ওরা দুজনেই নিহত।

একি ভয়ানক ঘটনা! এতো আগে কখনও হয়নি ভারতে। ভারতবাসী শ্রদ্ধা জানালো এই যুবকদের। ধন্য ধন্য তোমরা। আর সরকার ক্ষেপে উঠলো। হন্যে হয়ে উঠলো পুলিশ ওদের খোঁজে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকরা চিরকালই আছে। গণেশ দ্রাভিড আর রামচাঁদ দ্রাভিড ওরাও দুই ভাই। কিন্তু কত তফাৎ। ওরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে জানিয়ে দিল চাপেকারদের গতিবিধির কথা। বোম্বে থেকে দামোদরকে ধরা হ'ল। কিছুদিন পরে ধরা পড়লেন বালকৃষ্ণ। অকথ্য অত্যাচার হল ওঁদের ওপর। বিচারের ব্যবস্থা হ'ল তারপর। স্বীকার করলেন তাঁরা—হ্যাঁ, করেছি একাজ, মেরেছি ওদের। ভাল কাজ করেছি।

তার পর দু'ভাইএরই ফাঁসি হল, দামোদরের ১৮৯৮ সালের ১৮ই এপ্রিল আর বালকৃষ্ণের এক বছর পরে, ১৮৯৯ সালের ১২ই মে তারিখে।

ওদিকে সব লক্ষ্য করছেন বাসুদেব। তিনি-ই বা কম কিসে। তোমরা পেরেছ, আমি পারবো না। তোমরা বিদেশী অত্যাচারীদের মেরেছ, আমি মারবো আমাদেরই দেশের বিশ্বাসঘাতককে। মৃত্যুদণ্ড দেবো ওকে। এই আমার বিচার। সঙ্গে আছেন বন্ধু মহাদেব রাণাডে। একদিন আড্ডা থেকে ডেকে এনে দ্রাভিড ভাইদের গুলি করে মারলেন বাসুদেব আর রাণাডে।

তারপর এঁরাও হলেন বন্দী। আর বিচার করে ফাঁসির হুকুম হলো এঁদেরও। ১৮৯৭ সালের ৮ই মে বাসুদেবের আর ১০ই মে মহাদেবের ফাঁসি হ'ল।

স্বাধীনতার বেদীতে উৎসর্গ করা হ'ল এই সব তরুণ প্রাণ। মাতা, স্ত্রী পরিবার কারো জন্য কষ্ট নেই। সবার বড় দেশ মা। এই প্রথম স্বাধীনতার কারণে এইভাবে ফাঁসি হ'ল ভারতের ছেলেদের। নিজেদের প্রাণ দিয়ে এঁরা স্বাধীনতার লড়াইকে আরও জোরদার করে গেলেন।

শহীদ-এ-আজম ভগৎ সিং

কে প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন আমাদের খুব শোনা কথা কটি—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—বলতে পারো? কথাগুলির অর্থ—'ইন্‌কিলাব' অর্থাৎ বিপ্লব, 'জিন্দাবাদ' অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হোক। এই কথাগুলি প্রথম বলেছিলেন ভগৎ সিং। সর্দার ভগৎ সিং, শহীদ-এ-আজম ভগৎ সিং—যিনি নিজেই এক বিপ্লব আর দীর্ঘজীবী তিনি, দেশবাসীর মনে চিরকাল তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

পাঞ্জাবের লয়ালপুর জেলার ভাঙ্গা গ্রামে একটা জাঠ শিখ পরিবারে ভগৎ সিং জন্মেছিলেন ১৯০৭ সালে। এই পরিবারটির লোকজনেরা তাদের উদার স্বভাব, পরোপকারিতা আর দেশপ্রেমের জন্য সকলের কাছে সম্মান পেয়েছিলেন। ভগৎ এর বাবা ছিলেন কিশাণ সিং আর মা বিদ্যাবতী। কিশাণ সিং-এর ভাই অর্থাৎ ভগতের কাকা অজিত সিংকে ৩৭ বছরের জন্য মান্দালয় জেলে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলো ইংরেজ সরকার।

লাহোরের D. A. V. কলেজে পড়তে গিয়ে ভগৎ শিক্ষকদের মধ্যে ভাই পরমানন্দ আর জয়চাঁদ বিদ্যালঙ্কারকে পেয়েছিলেন। এই দুইজনেই ছিলেন দেশপ্রেমিক। শুধু যে নিজেরাই দেশকে ভালোবাসতেন আর দেশের স্বাধীনতা চাইতেন তা তো নয়; ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার ব্রতও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। ভগৎ সিং ক্রমে বুঝতে শিখলেন পরাধীন ভারতের দুঃখের কথা। স্বাধীনতা লাভ করাই হয়ে উঠলো তাঁর লক্ষ্য। ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন ভগৎ দেশপ্রেম। ক্রমে ছাত্রদের নেতা হয়ে উঠলেন। কলেজে ইউনিয়ন তৈরী করলেন ভগৎ সিং।

ইংরজেদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য ভারতে যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল তার এক কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের উপর তাই ইংরেজদের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। পাঞ্জাবের কত ছেলেকে যে জেলে পাঠানো হয়েছিল, কতজন

দ্বীপান্তরে গিয়েছিলেন আর কতজনের ফাঁসি হয়েছিল তার ঠিক নেই। ১৯১৫ সালে এমনই একজনের ফাঁসি হ'ল—নাম তাঁর কর্তার সিং। গদর পার্টির তিনি ছিলেন একজন নেতা। এর পরে ঘটলো সেই চোখের জলে ভেজানো জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড। ১৯১৯ সালে ইংরেজ সরকার রাউলাট আইন চালু করেন। যে কোন লোককে সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তার করা যাবে আর নির্বাসনে পাঠানো যাবে। ঠিক হ'ল যে, যে কোন এলাকা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী এলাকা বলে ঘোষণা করা যাবে। অর্থাৎ ভারতের মানুষকে দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হ'ল। সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বললে বা কাজ করলে তার গলা টিপে ধরার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু ভারতের মানুষ এত অত্যাচার সইবে কেন! চারিদিকে প্রতিবাদ সুরু হ'ল। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। চারদিকে হরতাল সুরু হ'ল। চললো মিছিল, হতে লাগলো সভা-সমাবেশ। পাঞ্জাবেও হরতাল হ'ল, ধর-পাকড় চলতে লাগলো। অমৃতসরে হরতালের দিন শান্ত জনতার উপরে পুলিশ গুলি চালালো। নিরীহ জনতাও ক্ষেপে গিয়ে সরকারী অফিস ও ব্যাংকে আগুন লাগিয়ে দিলে ইংরেজ সরকার শহরে সৈন্য মোতায়েন করে দেয়। জেনারেল মাইকেল ও-ডায়ারের উপর শহরের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল, খাতে সভা-সমিতি করা বন্ধ হয়। সভা-সমিতি যে বে-আইনী করা হয়েছে তা কিন্তু খুব ভালভাবে প্রচার করা হয়নি। তাই জালিয়ানওয়ালাবাগে যে প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়েছিল, সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয় নি। দলে দলে নরনারী এই সভায় যোগ দিতে যায়। এই পার্কের একটাই দরজা। চারিদিকে ছিল বড় বড় বাড়ী। ডায়ার ঐ গেটের মুখ থেকে গুলি চালিয়ে হত্যা করলে অসংখ্য নরনারীকে। পাঞ্জাবই শুধু নয়, সমস্ত ভারত এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানালো। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের নেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। আর যুবকদের মনে ইংরেজদের তাড়াবার প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ় হ'ল।

এই সব ঘটনাই ভগৎ সিংকে নাড়া দিচ্ছে। গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনে সাড়া দিয়ে তিনি কলেজ ছাড়লেন, ভর্তি হলেন লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজে। সেখান থেকেই গ্র্যাজুয়েট হলেন। এরপর আর দেরী না। ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে। প্রথমে অকালী দলে, পরে ১৯২৩ সালে হিন্দুস্থানে সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান পার্টিতে যোগ দিলেন ভগৎ। কিছুদিনের মধ্যে দলের সম্পাদক হলেন। সমস্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে সারা ভারতে বিপ্লব ঘটানোর জন্য এই দল চেষ্টা করতে

লাগলো, ভাবা হল স্বাধীন ভারতে কি ধরণের শাসন ব্যবস্থা চালু করা হবে সেই বিষয়ে।

কিন্তু মরার আগে জাগিয়ে তুলতে হবে দেশের যুবকদের। যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে। ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিপ্লবের দিকে। ১৯২৫ সালে লাহোরের 'নও জোয়ান সভা' গড়ে তুললেন ভগৎ সিং। হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট পার্টির আদর্শে এদের দীক্ষিত করতে লাগলেন। রাশিয়ার বিপ্লবের ধরণে বিপ্লব করার কথা ভাবা হতে লাগলো চন্দ্রশেখর আজাদ ও অন্যান্যদের সঙ্গে। এ বিষয়ে পড়াশোনাও চলতে লাগলো।

বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব ছিল তার উপর। নিজের দল ও অন্যান্য দলের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। ঘনিষ্ঠতা হ'ল শুকদেব, যশপাল, চন্দ্রশেখর আজাদ, বসন্তকুমার দত্ত, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখের সঙ্গে।

পুলিশের নজর কিন্তু এঁদের সকলের উপরেই আছে, আছে ভগতের উপরেও। তা থাক্। কিন্তু কাকোরি মামলার বন্দীদের মুক্ত করতে হবে। অবশ্য এ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। ১৯২৬ সালের দশেরার দিন লাহোরে একটি বোমা ফাটে। সন্দেহ পড়ে ভগতের উপর। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার।

ভারতের প্রায় সর্বত্র মানুষ ক্রমে উত্তাল হয়ে উঠেছে স্বাধীনতার জন্য। আইন সভায় কয়েকটা আসন দেওয়া হ'ল ভারতীয়দের। কিন্তু এতে বেশীদিন চুপ করিয়ে রাখা গেল না। পাঞ্জাবে, বাংলায় অন্যান্য প্রদেশে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্য আন্দোলন শুরু হল, ব্রিটিশ সরকার আবারও ভারতবাসীকে ভোলাবার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে 'সাইমন কমিশন' পাঠালে ভারতে। অনুসন্ধান করে কতটা অধিকার দেওয়া যায়, এ বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন। কিন্তু এই দলে কোন ভারতীয়কে নেওয়া হ'ল না। ঠিক হ'ল এই কমিশনকে বর্জন করা হবে। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী, যেদিন সাইমন কমিশন বোম্বেতে জাহাজ থেকে নামলো, সেদিন ভারতে ধর্মঘট হ'ল। ৩০শে অক্টোবর কমিশন লাহোরে পৌছায়। সেদিন সেখানে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল করা হ'ল। এই মিছিল পরিচালনা করলেন সকলের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও লালা লাজপত রায়। পুলিশ চালালো লাঠি। আঘাত পেলেন লালা। আর সেই ক্ষতের ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। সারা দেশবাসী

স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। কিন্তু চুপ করে রইলই না বিপ্লবী যুবকেরা। এই হত্যার নায়ক স্কটকে শাস্তি দিতেই হবে। ভগৎ সিং আর রাজগুরুর উপর ভার পড়লো স্কটকে হত্যা করার। ভুল করে তাঁরা লাহোরের পুলিশ-সুপারিনটেন-ডেণ্ট সণ্ডার্সকে গুলি করে মারলেন। বেশ কয়েকজন বিপ্লবী ধরা পড়লো। ভগৎ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। এখানে এসে চুপ করে রইলেন না। দলের একটি শাখা এখানে স্থাপন করা হ'ল। বাংলার বিপ্লবী সংঘগুলির কয়েকটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হ'ল। ভগৎ সিং আর পণ্ডিত রামশরণ দাস ক'লকাতা থেকে কিছু বোমা ও পিস্তল যোগাড় করলেন। ফিরে এলেন লাহোরে।

ছোটখাট হত্যাকাণ্ড করে কি হবে। একটা জোর ধাক্কা দেওয়া দরকার ইংরেজ সরকারকে। ওদের দম্ভে ঘা দেওয়া দরকার আর সেই সঙ্গে সকল ভারতবাসীকে নাড়া দেওয়া দরকার, হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি ঠিক করলে দিল্লীর আইন সভাগৃহে সভা চলাকালে বোমা ফেলা হবে। কে কে যাবেন এই কাজে। এই কাজ করে তো ফিরে আসা যাবে না। কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। ভগৎ সিং যাবেন, সঙ্গে বটু-কেশ্বর দত্ত।

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল। দিল্লীতে আইন সভা বসেছে। হঠাৎ 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' গর্জনে সভাকক্ষ কেঁপে উঠলো। ছড়িয়ে পড়লো ইংরেজ সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া 'লাল ইস্তাহার'। বোমার আঘাতে কেঁপে উঠলো চারদিক। এ-কি দুঃসাহস। কার কাজ এ। ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই যুবক। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর। হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে তৈরী তাঁরা গ্রেপ্তার হবার জন্য। তাঁরা তো পালাতে আসেন নি। নিজেদের জীবন দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে গেলেন সরকারকে আর জানাতে চাইলেন দেশবাসীকে।

এবার বিচার। বিচার আর কি? কি করা হবে সবই ঠিক। তবু সাজানো হ'ল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। অনেকদিন ভগৎ সিং চোখে ধুলো দিয়েছে— আর ছাড়া নয়। ধরা পড়েছে আরও দুজন সাংঘাতিক লোক— শিবরাম শুকদেব আর রাজগুরু। বিচার হল—ফাঁসির হুকুম হ'ল ভগৎ সিং, শুকদেব আর রাজগুরুর। বটুকেশ্বরের যাবজ্জীবন নির্বাসন।

১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ তিনটি ফাঁসির দড়িতে উৎসর্গিত হ'ল তিনটি বীর দেশপ্রেমিকের প্রাণ। আর যদি ঐ শহীদের মৃতদেহ দেখে জনগণ অনুপ্রাণিত

হয়, সেই ভয়ে ওঁদের দেয় ওঁদের আত্মীয়-স্বজন কারোর হাতে তুলে দেওয়া হ'ল না। গভীর রাতের অন্ধকারে পুলিশের লোক ফিরোজপুরের কাছে শতদ্রু নদীর তীরে দাহ করে এল তিনটি সোনার দেহ।

কিন্তু এই প্রাণ বিসর্জন ব্যর্থ হ'ল না। দেশবাসীকে এঁরা দেশকে ভালবাসতে শিখিয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্র সারা ভারতে সভাসমিতি করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন আর বললেন যে ভারতবর্ষ হাজার ভগৎ সিং চাইছে। ভারতের সকল সন্তান মাথা নুইয়ে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করছে 'শহীদ-ই-আজম' ভগৎ সিং আর তাঁর সহযোগিদের।

চন্দ্রশেখর আজাদ

ভারত জুড়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়েছে। ইংরেজ সরকারের কাজে কোনরকম সহযোগিতা করা হবে না, ইংরেজের তৈরী শিক্ষাও নেওয়া হবে না। গান্ধীজি ডাক দিয়েছেন। দলে দলে ভারতবাসী অফিস আদালত ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। ছাত্ররা ছেড়ে এসেছে স্কুল-কলেজ, ইংরেজ সরকারও ক্ষেপে উঠেছে, কঠোর হাতে দমন করা হচ্ছে আন্দোলন, দলে দলে ছাত্র, যুবক, প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, আদালতে বিচারের জন্য আনা হচ্ছে, বুঝতেই পারছো কিরকম বিচার হচ্ছে—আর তারপর পাঠানো হচ্ছে জেলে।

এই যখন অবস্থা তখন চলো একবার বারাণসীর এক দুর্দান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে ঘুরে আসি। ভয়ানক দাপট, ভয়ানক শাসন এই জেলা শাসকের। তারই এজলাসে ধরে আনা হয়েছে কয়েকজন অসহযোগ আন্দোলনকারীকে। আর তাঁদের মধ্যে আছে বছর ১৪ বয়সের একটি ছেলে। মুখে তার ছড়ানো কমনীয়তার সঙ্গে দৃঢ়তা, চোখে যেন কিসের দীপ্তি।

তাকে প্রশ্ন করা হ'ল—'তোমার নাম কি' ?

উত্তর—'আজাদ'। (স্বাধীন)

প্রশ্ন—'তোমার বাবার নাম কি ?'

উত্তর—'স্বতন্ত্র'।

ম্যাজিস্ট্রেট বুঝলেন ছেলেটি কি বলতে চাইছে। রক্তচক্ষু আরও ঘোর হয়ে ওঠে তাঁর। পরাধীন ভারতবাসী এত তার তেজ !

প্রশ্ন—'তোমার ঠিকানা কি ?'

উত্তর—'জেলখানা।'

নাঃ, আর তো সহ্য করা যায় না। আদেশ হ'ল, লাগাও পনেরো ঘা বেত। কচি ছেলেটির কচি হাতে হাতকড়াটাই ঢলঢল করছিল। এমন কচি গায়ে

বেত মারার হুকুম দিতে গলা একটুও কাঁপলো না ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর সেই কড়া হুকুম তামিল করলো যে কর্মচারী সে কিন্তু ভারতেরই লোক। কি করবে ব'ল তার তো চাকরী। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ছেলেটিকে মারা হ'ল বেত। একটা আঘাত দেওয়া হয়, রক্তের রেখা ফুটে ওঠে শরীরে, আর ছেলেটি চিৎকার করে না মাগো নয়। বলে ওঠে 'বন্দেমাতরম্', হ্যাঁ সেও তো মাকেই ডাকা, আর চিৎকার 'গান্ধীজি কি জয়।'

কে বলতো এই ছেলে। বিখ্যাত দেশপ্রেমিক চন্দ্রশেখর আজাদ। তোমাদের থেকে কতই বা বড় ছিলেন বয়সে। কতখানি তেজ ছিল তাঁর মধ্যে ভাবো একবার।

উত্তর প্রদেশের বদর্কা গ্রামের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সীতারাম তেওয়ারীর ছেলে চন্দ্রশেখরের তেওয়ারী পদবী লোকে ভুলেই গেল, সে নিজেও বোধহয় ভুলে গেল। সকলেই তাকে ভালবেসে তার নিজের দেওয়া 'আজাদ' পদবীতেই ডাকতে শুরু করলে তাকে, নাম হয়ে গেল তার 'চন্দ্রশেখর আজাদ'। ভগৎ সিং নাকি ঠাট্টা করে বলতেন তাঁকে যে তোমার জন্য দুটো ফাঁসির দড়ি লাগবে ইংরেজদের, একটাতে হবে না। তিনি উত্তর দিতেন যে ও দড়ি তোমার জন্যই থাক্, আমার পিস্তল যতদিন সঙ্গে আছে, কেউ আমাকে দড়িতে ঝুলয়ে নাচাতে পারবে না।

সীতারাম তেওয়ারীর অবস্থা তত ভাল ছিল না। চাকরীর খোঁজে চলে আসেন তিনি মধ্যপ্রদেশে। সেখানে সামান্য একটি চাকরী জোটে। এখানেই ঝাবুয়া জেলায় ১৯১৬ সালের ২৩শে জুলাই সীতারামের স্ত্রী জগরাণী দেবীর কোলে জন্মালেন এই দামাল চন্দ্রশেখর। ছোটবেলা থেকেই চন্দ্রশেখর একরোখা। গোঁড়ামি, সংস্কার কিছুই তার পছন্দ নয়। ব্রাহ্মণ পরিবারের 'ভাল ছেলেটি' হয়ে থাকার চেয়ে দুর্দান্ত ভীল বালকদের সঙ্গে খেলা করা কত মজার। ওদের পড়তে হয় না, ওরা বকুনি খায় না, বনে-জঙ্গলে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায়, শিকার করে। কিন্তু বাবা এসব মানবেন কেন। আর সব বাবার মতই তিনিও চান ছেলে শান্ত হোক, ভাল হোক, পড়াশুনা করুক। বাধ্য হয়েই ধমকাতে হয় ছেলেকে। ফল হ'ল এই যে, ছেলে বাড়ী থেকে পালিয়ে চলে এল বারাণসী, বারো, তের বছর বয়স তখন তার। এখানে ওখানে ঘুরে ভেলুপুরাতে থাকার জায়গা জোটালে একটা। একটা পাঠশালাতে ভর্তিও হওয়া গেল। কিন্তু কাজের ক্ষেত্র যার অনেক বড় এই পাঠশালায় তাকে ধরবে কেন।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। অস্ত্র বিপ্লবও চলছে। পাশাপাশি গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনও চলছে। কত লোক জেলে যাচ্ছেন, কতজনের ফাঁসি, দ্বীপান্তর হচ্ছে। চন্দ্রশেখর কি চুপ করে থাকতে পারেন? রক্তে তো তাঁর ঝড় উঠেই আছে। গান্ধীজি ডাক দিলেন দেশবাসীকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে। চন্দ্রশেখর চলে এলেন পাঠশালা ছেড়ে। হয়ে উঠলেন একজন কর্মী। আর তারপর ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

ক্রমে অসহযোগ আন্দোলন থেমে গেল। কিন্তু চন্দ্রশেখরের বুকের কাঁপন থামলো না। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। আর ঐ ভাল মানুষের মত শুধু পীড়ন সহ্য করা চলবে না। আঘাতের বদলে আঘাত দিতে হবে। সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব বলে মনে হল তাঁর।

এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে। উত্তর প্রদেশে তখন জোরদার দল ছিল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টি। যোগাযোগ করে এই দলে যোগ দিলেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই দলের অন্যতম কর্মী ও নেতা হয়ে উঠলেন। দলের কাজে সারা উত্তরপ্রদেশ ঘুরে বেড়ালেন। যোগাযোগ করলেন বিভিন্ন দলের সঙ্গে। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টি চেষ্টা করছিলো ভারতের সব বিপ্লবী দলকে সংগঠিত করে একসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। এই বিরাট বিপ্লবের জন্য টাকা চাই। সরকারী টাকা লুট করে এরা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ১৯২৫ সালে কাকোরি রেল স্টেশনে ট্রেন থেকে সরকারী টাকা লুট করা হয়। যাঁরা এ কাজে জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ধরা পড়ে যান। তাঁদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত 'কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা' সাজানো হয়। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টি ১৯২৬ সালে বড়লাটের ট্রেন উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেন। অবশ্য এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। ১৯২৮ সালে সণ্ডার্সকে হত্যা করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত বোমা ফেলেন আলোড়ন জাগাতে। এইসব কর্মকাণ্ডের পিছনে যাঁরা ছিলেন চন্দ্রশেখর তাঁদের একজন। পুলিশ তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে থাকে। নানা ছদ্মবেশে তিনি সারা উত্তর ভারতে ঘুরে বেড়ান। ১৯৩০ সালে সরকার ঘোষণা করলেন চন্দ্রশেখরকে ধরিয়ে দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরা গেল না।

চন্দ্রশেখর আর তাঁর সহকর্মিরা রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ধরনে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার কথা ভাবতে শুরু করেন। হাতে কলমে শিক্ষা নেওয়ার জন্য

দলের কোন কর্মীকে রাশিয়ায় পাঠানো দরকার বলে এঁরা চিন্তা করলেন। দল থেকে ঠিক করা হ'ল পৃথ্বীজিৎ আজাদকে এই কাজে রাশিয়ায় পাঠানো হবে। তাঁকেও তখন পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁরও মাথার দাম অনেক টাকা। সকলেই সরকারের চোখে ফেরারী। অথচ আলোচনা একটা হওয়া অত্যন্ত দরকার। গোপনে গোপনে ঠিক হ'ল চন্দ্রশেখর, পৃথ্বীজিৎ আর শুকদেবরাজ এলাহাবাদের অ্যালফ্রেড পার্কে দেখা করবেন। তারিখ ঠিক হ'ল ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ সাল। আলোচনা হয়ে গেল। ঠিক করা হ'ল পৃথ্বীজিৎ রাশিয়া চলে যাবেন। দল থেকে তাঁকে একটি পিস্তল দেওয়া হ'ল। বাকী ব্যবস্থা তাঁকে করে নিতে হবে। সভা শেষ হ'ল, এবার পার্ক ছেড়ে গোপন আস্তানায় চলে যাবেন সকলে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বিপদ যা ঘটে যাবার তা ঘটে গেছে। পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। একজন সহকর্মীই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই সভার কথা পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সমস্ত পার্কটা ঘিরে ফেলেছে। দূর থেকেই তারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোতে শুরু করলো। কিন্তু চন্দ্রশেখর তো 'আজাদ'ই থাকবেন বলে দিয়েছেন, তাঁকে ধরে কে? নিজের পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে কয়েকজন পুলিশকে ঘায়েল করলেন তিনি। শেষ গুলিটি রইলো নিজের জন্যে। শেষ গুলিটি নিজের গলায় ছুঁড়ে সকলের সামনে মৃত্যুবরণ করলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। আজাদ এই গানখানি বেঁধেছিলেন—

"দুশ্‌মন কী গোলিয়াঁ কা হম্‌ সামনা করেঙ্গে।
আজাদ হী রহে হ্যায়, আজাদ হী রহেঙ্গে॥"

চিরবিপ্লবী রাসবিহারী

ভারতের রাজধানী দিল্লী। কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছে ইংরেজ দিল্লীতে। সেই দিল্লীতে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছে। আলোর ফুলে সাজানো হয়েছে সরকারী রাস্তাঘাট আর বাড়ী। ইংলণ্ডের নতুন সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে ২৩শে ডিসেম্বর এই উৎসব। সময় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ। বড়লাট তাঁর স্ত্রী, রাজকর্মচারী, দেশীয় রাজা—সকলকে নিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে এক শোভাযাত্রা নিয়ে দরবারে আসবেন আর সম্রাটের নামে ভারত শাসন করার দায়িত্ব নেবেন। শোভাযাত্রার প্রথম দিকে হাতির পিঠে রয়েছেন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ আর তাঁর স্ত্রী, পিছনে অন্যান্যরা।

কিন্তু হঠাৎ একি ! বিনা মেঘে বজ্রপাত। চাঁদনীচকের কাছাকাছি শোভাযাত্রা আসতে বড়লাটের হাতির উপর এসে পড়লো এক বোমা। মাহুত মারা গেল। বড়লাট হলেন ভয়ানক আহত। নিয়ে যাওয়া হ'ল হাসপাতালে।

বোমাটা ফেলেছিলেন বাংলার বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস, লীলাবতী নামের এক তরুণীর ছদ্মবেশে, আর পেছনে মাথা ছিল রাসবিহারীর, রাসবিহারী বসু, যিনি ব্রিটিশ সিংহকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। বনবিভাগের এই কর্মচারী রাসবিহারীকে সবাই জানতো সরকারের বিশেষ অনুগত। কিন্তু পুলিশের গোয়েন্দারা খুঁজে বার করলো সব। আর রাসবিহারীর মাথার দাম উঠলো সাড়ে সাত হাজার টাকা। ব্রিটিশের তোষামুদে রাজা-রাজড়ারা বললেন রাসবিহারীকে ধরে দিলে আমরা এক লক্ষ টাকা দেবো।

কে বলতো এই রাসবিহারী ? রাসবিহারীর জন্মসন নিয়ে দু'রকমের মত। বর্ধমানের সুবলদহ গ্রামে ১৮৮০ সালে তাঁর জন্ম। এটা কারো মত। আর একটা মত হল ১৮৮৬ সালে হুগলীর পারলবিঘাতী গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। মা মারা যান তাঁর একেবারে ছোটবেলায়। বাবা বিনোদবিহারী বসু আবার বিবাহ করলেন। এই নতুনমা ছেলেকে আপন

করে নিলেন। চন্দননগরে পড়াশুনা করতেন কিন্তু পড়াতে তাঁর মোটেই মন ছিল না। তার থেকে ব্যায়াম, খেলাধূলা অনেক বেশী ভাল। শেষ পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন রাসবিহারী।

বাবা কাজ করতেন সরকারী ছাপাখানায়। ছেলে সেখানে কাজ পেলেন। ক্রমে শিখলেন ইংরাজী লেখাপড়া আর সঙ্গে টাইপের কাজ।

এরপর তিনি চন্দননগরে চলে আসেন। চন্দননগরে বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, আর মনের মধ্যে যে দুঃসাহসী বীর বাসা বেঁধেছিল সেই বীর জেগে ওঠে। রাসবিহারী বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। মানিকতলা বোমার মামলার সঙ্গে তাঁর একটা যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া গেল। সকলে তাঁকে দেরাদুনে চলে যেতে উপদেশ দেন। সেখানে কিছুদিন থেকে তারপরে বনবিভাগের কাজ নেন। ভাব দেখাতেন তাঁর মত রাজভক্ত কমই আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন তিনি। পাঞ্জাব ও দিল্লীর বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর পরামর্শ চলত।

এদিকে সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীর দরবারে উৎসব এসে পড়লো। রাসবিহারী ঠিক করলেন এমন কিছু করতে হবে যাতে ভারতবাসীর প্রতিবাদ জানানো যায়। সকলের মধ্যে একটা সাড়া জাগানো দরকার। কলকাতা থেকে যোগাড় করলেন বোমা। এলেন বসন্ত বিশ্বাস নামের তরুণ। রাসবিহারীর পরিকল্পনায় লীলাবতী সেজে বসন্ত বোমা ছুঁড়লেন বড়লাটের উপর।

কেউই ধরা পড়লো না। এই বসন্ত বিশ্বাসই আবার বিষিণ দাস সেজে লাহোরের পুলিশ ক্লাবে বোমা ছুড়লেন।

খুঁজতে খুঁজতে দু'বছর বাদে ১৯১৪ সালে পুলিশ কলকাতার এক মেসের কতকগুলো কাগজের লেখা থেকে সূত্র পেয়ে গ্রেপ্তার করলো অমৃত ওরফে শশাঙ্ক হাজরা, দীনেশ দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে প্রমুখকে আর দিল্লীর এক শিক্ষক আমীরচাঁদকে। আর গ্রেপ্তার করা হল দীননাথ তলোয়ারকে। দীননাথ কিন্তু তলোয়ারের মত শক্ত ছিলো না। পুলিশের অত্যাচারে স্বীকার করলে সব কথা। একে একে বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী, বসন্ত সবাই ধরা পড়লেন। ধরা গেল না রাসবিহারীকে! রাসবিহারী ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন লাহোর, অমৃতসর, কলকাতা, চন্দননগর আরও কোথায় কোথায়। কখনো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কখনো জমাদার সাজে। আর এরই

মধ্যে রিভলবার আর বোমা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দুয়েকবার হলেন আহত। কি মারাত্মক ছিলেন তিনি।

এদিকে আসামীদের বিরুদ্ধে চললো মামলা। আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ আর বসন্তের হল ফাঁসি।

রাসবিহারী অস্থির, ছোট ছোট কিছু করলে চলবে না। ভারতে এক বড় ধরনের বিপ্লব করতে হবে। পৃথিবীতে মহাযুদ্ধ বেঁধেছে। জার্মানদের কাছ থেকে অস্ত্র আনতে হবে, আর উত্তর ভারতের সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়াতে হবে। সৈন্যরা যদি শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে ঠেকাবে কে?

কাজ শুরু করলেন। রাসবিহারী, পিংলে, শচীন স্যান্যাল, নগেন দত্ত, বিষেণ দাস, জগৎসিং, বিনায়ক রাও কাপলে, বিভূতি হালদার, কর্তার সিং, নলিন মুখার্জী, মুলাসিং, দিল্লী সিং, যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন)। দিল্লী, এলাহাবাদ, মীরাট, বেনারস, জব্বলপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, জলন্ধর, কোহাট, বান্নু, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিং-সব জায়গায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হ'ল। বাংলার বিপ্লবীরা তৈরী হতে লাগলেন। সাঁওতালরা প্রস্তুত হলেন। ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুরের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গেও যোগাযোগ হ'ল। বিদেশে যে সব বিপ্লবীরা ছিলেন তারাও অনেকে দেশে ফিরতে শুরু করলেন।

কিন্তু এই মহা আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বিপ্লবীদের খুঁজে খুঁজে গ্রেপ্তার করা হল। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে গেল ইংরাজ সরকার নানা জায়গায় হানা দিয়ে। অতর্কিতে ইংরাজ বাহিনী আক্রমণ করে বিপ্লবী সেনাদের বন্দী করলো। কত সৈন্যকে হত্যা করলো পশুর মত। শুনলে শিউরে উঠবে যে, দুজন ভারতীয়-ই টাকার লোভে ফাঁস করে দিয়েছিল সব খবর ইংরাজ শাসকদের কাছে।

কিন্তু রাসবিহারী আর পিংলেকে ধরা গেল না। অবশ্য পিংলে মীরাটের ছাউনিতে বোমা ফেলবার জন্য সেখানে গেলে ধরা পড়ে গেলেন।

১৯১৫ সালের ২৭শে এপ্রিল শুরু হল মামলা এই ষড়যন্ত্রের আসামীদের বিরুদ্ধে। নাম দেওয়া হল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। পরপর তিনটি মামলায় সত্তরটি তাজা প্রাণের হল ফাঁসি। সামরিক আদালতের বিচারে কত সৈন্য যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল!

এদিকে রাসবিহারী সারা উত্তর ভারতেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অন্যান্য বিপ্লবীরা, বিশেষত যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু দেশ ছেড়ে যেতে রাজী নন দেশের প্রিয় সন্তান। কিন্তু সকলের নির্দেশে

যেতেই হল। বিদেশে থেকেও তো কিছু করা যেতে পারে। রাসবিহারী গেলেন জাপানে। ব্রিটিশের বিরোধী জাপান, সেই দেশে নিজেই গেলেন পাসপোর্ট অফিসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পি, এন, ঠাকুরের ছদ্মনামে। কবির জাপান যাত্রার আয়োজনের বন্দোবস্ত দেখে আসতে হবে। পাসপোর্ট পাওয়া গেল। সান্ন-কি-মারু জাহাজে চড়ে সিঙ্গাপুর, হংকং হয়ে জাপানে। চীনের বিখ্যাত নেতা সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে আলাপ হল। ইংরাজ সব খবরই রেখেছে। জাপান সরকারকে বলে পাঠিয়েছে রাসবিহারী আর হেরম্বলাল গুপ্তকে জাপান থেকে বার করে দিতে হবে। জাপানের সঙ্গে তখন ইংরাজদের মিত্রতা চলছে। সরকার রাজী। সান-ইয়াৎ-সেনের পরামর্শে রাসবিহারী এলেন জাপানের বিখ্যাত 'ব্ল্যাক ড্রাগন' দলের নেতা মিৎসু তোয়ামার কাছে। এই পার্টি তাঁকে আশ্রয় দিলেন। এক রুটির কারখানার মালিক সেমোর বাড়ীতে থাকলেন তিনি। হেরম্ব চলে গেলেন আমেরিকা।

কিন্তু লুকিয়ে কতদিন থাকবেন। স্থির হ'ল রাসবিহারী জাপানের নাগরিকত্ব নেবেন আর সেমোর মেয়ে তোসিকোর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হবে। মহৎ-প্রাণা এই মেয়েটি এই অজানা অচেনা বিপ্লবীকে বিবাহ করতে রাজী হলেন। এরপর রাসবিহারী জাপানের নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লাগলেন। জাপানী ভাষায় বই লিখতে লাগলেন আর ভারতীয় চিন্তার কথা জাপানের মানুষকে জানাতে লাগলেন।

বিপ্লবের ভাবনা কিন্তু মুছে গেল না। তৈরী করলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। আর জাপান যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিল, জার্মানীর পক্ষে, ইংরেজদের বিপক্ষে, তখন গড়লেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। জাপান সরকার তাঁকে সহায়তা করলেন। জাপান সিঙ্গাপুর, বর্মায় অনবরত ঘুরতে লাগলেন। যেসব জায়গা জাপান অধিকার করেছিল সেখানকার ভারতীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলেন। জাপানীরা যে সব ভারতীয় সৈন্যদের (যারা ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে হেরে গিয়েছিল) বন্দী করেছিল তাদের রাসবিহারীর সৈন্য দলে যোগ দিতে দেওয়া হল। রাসবিহারী তাঁর উদ্দেশ্য ছোট ছোট পুস্তিকায় লিখে ছড়িয়ে দিলেন। রেডিওতে বক্তৃতা দিলেন, গান্ধীজী, জওহর লাল, বল্লভভাই প্যাটেল, খান আবদুল গফুর খান আর সারা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। টোকিওতে এক সম্মেলন করে রাসবিহারী তাদের লক্ষ্যের কথা সবাইকে জানালেন। ঘোষণা করা হল লীগের আদর্শ একতা, বিশ্বাস আর

বলিদান। ব্যাঙ্ককে যে সম্মেলন হল সেখান থেকে রাসবিহারী ডাক পাঠালেন সুভাষকে। সুভাষ তখন বার্লিন থেকে একই ভাবে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করার চেষ্টা করে চলেছেন। রাসবিহারী বুঝেছিলেন তাঁর কাজ শেষ করতে পারেন সুভাষ। তিনিও চিরবিপ্লবী, রাসবিহারী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। সুভাষ তুমি এসো।

সে গল্প শুনবে সুভাষের কথা শুনতে গিয়ে। কেমন করে অসীম বিপদের মধ্যে দিয়ে সাবমেরিনে করে জার্মানী থেকে জাপানে এসে পৌঁছলেন অসীম সাহসী সুভাষ। রাসবিহারী তাঁর হাতে তুলে দিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব।

অসুস্থ রাসবিহারীর এবার ছুটি হয়ে এলো। স্ত্রী তোসিকো কবেই মারা গেছেন। ছেলে মাসাইদ জাপান সেনাদলে ছিল। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে সেও নিহত হয়েছে। নিজে দেখেছেন সুভাষ তাঁর স্বপ্নকে রূপ দিতে চলেছে। এক সত্যিকারের সৈন্যদল তৈরী হয়েছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অস্থায়ী স্বাধীন সরকার স্থাপন করা হয়েছে। আজাদী সেনা ভারতের মাটিতে পা রেখেছে। জয় করেছে ময়রাং, কোহিমা।

অসুস্থ রাসবিহারী হাসপাতালের শয্যায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। জাপানী সম্রাট তাঁকে জাপানের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দি সেকেণ্ড অর্ডার অব দি মেরিট' পদক দিয়ে সম্মান জানালেন। এই প্রথম এক বিদেশীকে এই সম্মান জানানো হল। ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী টোকিওর হাসপাতালে জীবন-দীপ নিভে গেল চিরযুবা রাসবিহারীর।

পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবী মাথা নোয়ালেন শ্রদ্ধায়। সুভাষ পতাকা অবনমিত করলেন। জাপান সম্রাট তাঁর শবাধার বহনের জন্যে রাজ শকট পাঠিয়ে দিলেন।

স্বদেশের মাটিতে শেষ শয্যা নেবেন এই আশা ছিল রাসবিহারীর। সে সাধ পূর্ণ হল না। কিন্তু যিনি বিপ্লবী তাঁর কাছে সমস্ত পৃথিবীই তো স্বদেশ।

স্বাধীনতার সূর্য-সূর্য সেন

ভারতমায়ের আর এক বীর সন্তান চট্টগ্রামের সূর্য সেন। নয়াপাড়া গ্রামের রাজমণি সেন আর শশীবালা দেবীর ছেলে সূর্য সেনকে কিন্তু মাস্টারদা নামেই বেশী ডাকা হ'ত। বহরমপুরের ব্রজমোহন কলেজ থেকে পাশ করে চট্টগ্রামের উমাতারা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন সূর্য, সকলে ডাকতো 'মাস্টারদা'। শান্ত ধীর অতি নিরীহ এই মাস্টারদা।

কলেজে পড়বার সময়েই দেশের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। নানা জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল। বন্ধু অনুরূপ সেন আর তিনি ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন যে লড়াই করেই স্বাধীনতা লাভ করতে হবে।

চট্টগ্রামে শিক্ষকতা করার সময়ে তাঁর সঙ্গে অনেক লোকের ঘনিষ্ঠতা হ'ল। নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, চারুবিকাশ দত্ত, রাজেন দাস প্রমুখ যুবকেরা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সকলেই মিলে স্থির করলেন যে চট্টগ্রামের তরুণ-যুবকদের নিয়ে দল তৈরী করতে হবে। তাদের নিয়ে সমাজ সেবা করতে হবে। সমিতি তৈরী করে লাঠিখেলা, ব্যায়াম প্রভৃতি দেখাতে হবে। গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলি চালানো শেখাতে হবে। ভবিষ্যতে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই-এর জন্য তৈরী হতে হবে।

তিনি 'সাম্য আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সমিতির মধ্য দিয়েই প্রস্তুত হতে লাগলেন ওঁরা। কিন্তু মাস্টারদাকে দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এই শান্ত, স্থির মানুষটি ভিতরে ভিতরে এত কঠিন। এত তেজস্বী। সকলের মতামত শুনে নিজের মতামত দেন তিনি সব বিষয়ে। কিন্তু এত দৃঢ় তার মত, এত যুক্তি পূর্ণ যে সেটি গ্রহণ করতেই হ'ত সকলকে।

এদিকে গান্ধীজী তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেছেন। তিনি সব দলকেই ডাকলেন তাঁর এই আন্দোলনে যোগ দিতে। তিনি আবেদন

জানালেন সব বিপ্লবীদের কাছে তাদের কার্যসূচী এক বছরের জন্য বন্ধ রাখতে। এই একটা বছর তিনি চেষ্টা করবেন ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। সকলেই তাঁকে মান্য করলেন, সূর্য সেনও। ক্রমে তিনি চট্টগ্রাম কমিটির সম্পাদক হ'লেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলেছে লড়াইর আয়োজন।

তাঁর গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিলেন চট্টগ্রামের যুবকেরা। এসেছেন ত্রিপুরা সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, অমরেন্দ্র নন্দী, নরেশ রায়, ধীরেন দে, মনোরঞ্জন সেন, হিমাংশু সেন, বিনোদ চৌধুরী, বিনোদ-বিহারী দত্ত, জিতেন্দ্র দাসগুপ্ত, শম্ভু দস্তিদার, সরোজ গুহ—আরও কতজন এলেন তার দলে, আর আগে যাঁদের নাম করেছি তারা তো ছিলেনই।

কিন্তু এসব কাজের জন্য অনেক টাকা চাই। টাকা জোগাড় করা হ ল মা, দিদি, বৌদিদের, কাছ থেকে—গয়নাও খুলে দিলেন তারা। আরও চাই। আসাম-বাংলা রেলপথের ট্রেন লুঠ করে ১৮০০ টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু পুলিশও সন্ধান করে মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করলে। তবে কয়েকজন পালিয়ে গেলেন। বহুদিন ধরে চললো বিচার, তারপর ছাড়া পেলেন তাঁরা। এবার আর চাকরী করা নয়। ছেড়ে দিলেন চাকরী, স্ত্রী-সংসার কিছুই আর তাঁকে আটকাতে পারলো না। ক্রমে বাংলা, আসাম, উত্তরপ্রদেশেও তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। আবার তিনি গ্রেপ্তার হলেন, তবে কিছুদিনের মধ্যে ছাড়া পেলেন।

আস্তে আস্তে যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হ'ল। চট্টগ্রাম রিপাবলিক্যান আর্মি তৈরী হ'ল। আর খুব গোপনে তাঁরা শিক্ষা নিতে লাগলো। সুভাষচন্দ্র বসু সূর্য সেনের দলকে গোপনে গোপনে সমর্থন জানিয়ে গেলেন।

এবার কাজ সুরু হবে। ঠিক হল একদিনে একসঙ্গে চট্টগ্রামের পুলিশ লাইন, অস্ত্রাগার, জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন থানা দখল করে নেওয়া হবে। টেলিফোন, টেলিগ্রামের তার কেটে, খুঁটি উপড়িয়ে, রেল লাইন উঠিয়ে ফেলে যোগাযোগের পথ বন্ধ করে রাখা হবে। সমস্ত দলকে ছোট ছোট উপদলে ভাগ করে এক এক দলকে এক এক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল এই অভিযানের দিন ঠিক হল।

অম্বিকা চক্রবর্তীর দল টেলিফোন লাইন কেটে দিলেন। টেলিফোন ভবনে আগুন লাগানো হল। মালগাড়ি লাইন থেকে ফেলে রাস্তা বন্ধ করে রাখলেন আর এক দল। টেলিগ্রাফের তার কাটলেন। জেনারেল গণেশ ঘোষ আর

জেনারেল অনন্ত সিংহের দল পুলিশ লাইন দখল করলেন। এই দলে মাস্টার-দাও ছিলেন। এখানকার অস্ত্রাগার থেকে কিছু রাইফেল-কার্তুজ পাওয়া গেল। জেনারেল লোকনাথ বলের দল ওখানকার সৈন্যদের অস্ত্রাগার লুঠ করে রাইফেল পেলেন। পাহাড়তলির ইউরোপীয়ান ক্লাব বন্ধ ছিল তাই ধ্বংস করা হল না।

এবার দলের প্রধান কেন্দ্রে এসে জাতীয় পতাকা তোলা হ'ল। তিনবার রাইফেল গর্জন করে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করা হ'ল। স্বাধীন চট্টগ্রামের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হ'ল। সর্বাধিনায়ক করা হ'ল সূর্যসেনকে। আকাশ বাতাস মুখরিত করে যুবক দল বিপ্লবের জয় ঘোষণা করলেন।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এবার সমস্ত, শক্তি দিয়ে এদের ধ্বংস করতে তৈরী হ'ল। মেশিনগানের গোলা দিয়ে তারা এদের মারতে এলেন। খবর পেয়ে বিপ্লবীরা পালিয়ে চলেছে তখন শহরের বাইরে। কিন্তু পালাতে মন চায় না। তাই মাস্টারদা সকলের মত শুনে ফেরার নির্দেশ দিলেন। সকলে আশ্রয় নিলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। শহরে লোক পাঠানো হ'ল খবরাখবর আনবার জন্যে। কিন্তু তারা কেউ ফিরলো না। গণেশ ঘোষ আর অনন্ত সিংহের দল মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ক'লকাতায় চলে যেতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু সরকার খবর পেয়ে গেছে জালালাবাদের। পাহাড়ের পাশ দিয়েই রেলপথ গেছে। এক ট্রেন বোঝাই সৈন্য ওখানেই নামলো। শুধু পুলিশের দ্বারা হবে না. ঐ ক'জন যুবককে ধরবার জন্য সৈন্য প্রয়োজন হল।

কোথায় ভয় পাবেন ছেলেরা, তা নয়, সকলে আনন্দ করতে লাগলেন। এই তো চাই—এবার সত্যিকার লড়াই হবে! যে সব রাইফেল বন্দুক পাওয়া গেছে সেগুলির সদ্ব্যবহার করা যাবে। মাস্টারদা লোকনাথ বলকে করলেন নেতা। সৈন্যদল এগিয়ে আসতে সুরু ক'রল। কিন্তু প্রথম দলকে নামিয়ে দিলেন স্বাধীনতার সৈনিকেরা। কিন্তু শুধু রাইফেল দিয়ে তো মেশিনগানকে থামানো যায় না, তাছাড়া সংখ্যাতেও ওরা অনেক বেশী। প্রথমেই গুলি লাগলো ১৪ বছরের বালক টেগরার। একে একে অনেকে হতাহত হলেন। রাতের অন্ধকারে নিহত সাথীদের সৈনিকের সম্মান জানিয়ে অন্যেরা নেমে গেলেন। পাহাড় থেকে অনেক ঘুরে পৌঁছালেন কোয়েপাড়ায় বিনয় সেনের বাড়ী। ওদিকে সৈন্যবাহিনী পাহাড়ে উঠে পেলে ঐ মৃতদেহগুলি। তারা টুপি খুলে সম্মান জানালো, তারপর ওখানেই আগুন জ্বালিয়ে দিল। শহীদের

চিতার আগুনে ভারতের আকাশ লাল হয়ে গেল। আগুনের অক্ষর দিয়ে শহীদদের নাম লেখা হ'ল আকাশে।
পালিয়ে থেকেও সূর্য সেনের দলের ছেলেরা চুপ করে নেই। রজত সেন প্রভৃতি কয়জন ইউরোপীয়ান ক্লাব দখল করতে গিয়ে পুলিশের তাড়ায় পালাতে বাধ্য হলেন। পুলিশ ওদের ডাকাত বলে প্রচার করে, ধরে ফেললো দুজনকে। বাকীরা মুখোমুখি লড়াই করে মারা গেলেন। এদিকে ক'লকাতায় ধরা পড়ে গেছেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, জালালাবাদের যুদ্ধে আহত অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল—আরও অনেকে।

পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে সূর্য সেনকে। দলের লোকেরা ঠিক করলেন মাস্টারদাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন। কে যাবে? সূর্য সেন কিছুতেই গেলেন না। সারা চট্টগ্রামে মিলিটারী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সকলকে প্রশ্ন করছে, বল কোথায় সূর্য সেন, কোথায় অন্যরা।

চট্টগ্রামের আদালতে বত্রিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। মাস্টারদা পরিকল্পনা করলেন জেলখানা ভেঙে ওদের উদ্ধার করা হবে। অবশ্য সফল হলেন না। তাতে কি? নিহত হল চট্টগ্রামের কুখ্যাত গোয়েন্দা আসানুল্লত, শশাঙ্ক দারোগা, ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুনো, কুমিল্লার ডি, এস, পি, এলিসন।

এদিকে পুলিশ খবর পেয়ে গেছে যে সূর্য সেন আছেন ধলঘাটে। কিন্তু ঐ ভয়ানক সূর্য সেনকে পুলিশ দিয়ে ধরা যাবে না। ক্যাপ্টেন ক্যামেরুণ গুর্খা সৈন্য নিয়ে ঘিরে ফেললো বাড়িখানা। কিন্তু ওঁরা সহজে ধরা দেবেন কেন? দু'পক্ষে লড়াই হ'ল। কত সাহস ছিল ওঁদের ভাবো একবার। একদিকে সৈন্য বাহিনী-অপর দিকে মাস্টারদা, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করলেন নির্মল সেন আর অপূর্ব সেন। মারা গেলো ক্যামেরুণ। আর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সৈন্যদের মধ্য দিয়ে পথ করে বেরিয়ে গেলেন মাস্টারদা আর প্রীতিলতা।
ওঁরা আশ্রয় নিলেন জৈষ্ঠ্যপুরাতে। কিন্তু মাস্টারদার লোহার মত শক্ত মনও দুর্বল হয়ে ওঠে। কত শোক আর সহ্য করবেন। তবু প্রীতিলতাকে অনুমতি দিতে হয় ইউরোপীয়ান ক্লাব দখল করতে যাবার। দু'দুবার চেষ্টা করেও ওখানে কিছু করা যায় নি। এবার কিন্তু সফল হলেন বিপ্লবীরা। কিন্তু প্রীতিলতা বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন।

সূর্য সেন কোথায় রয়েছেন আবার পুলিশ খবর পেয়ে গেল। আর খবর পেল এ দেশেরই নেত্র সেন নামে এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে। তার সন্ধান হয়েছিল পাড়ার কাকীমা ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে কারা যেন আসা-যাওয়া করে। নেত্র ভাবলে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার সেই পাবে। ঠিক সন্দেহ করে ১৯৩২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সৈন্য এসে ঘিরে ফেললো গৈরালা গ্রামের ক্ষীরোদপ্রভার বাড়ী। টের পেয়েই সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত আর বাকীরা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন জঙ্গলের দিকে। কিন্তু অন্ধকারে জঙ্গলে এক সৈন্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই সে জাপটিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে। এতদিনের চেষ্টায় ধরা গেল সূর্যকে যাঁর তখন মাথার দাম ১০,০০০ টাকা।

তিনি বন্দী হওয়ার পরেও কিছুদিন তাঁর দল কাজ করে গেলো, আস্তে আস্তে অধিকাংশই ধরা পড়ে গেলেন। কেউ কেউ পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন।

মাস্টারদার বিচার স্থরু হ'ল। বিচার আর কি, সবই তো ঠিক করা আছে। হুকুম হ'ল ফাঁসির। অবশেষে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মধ্যরাতে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হ'ল।

তিনি বলে গেছেন দেশবাসীকে এগিয়ে যেতে। বলে গেছেন ভয় নেই, জয় আমাদের হবেই।

প্রীতিলতা

শান্ত, শিষ্ট মেয়ে প্রীতিলতা। বাবা জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার জেলাশাসকের অফিসের বড় বাবু, মা প্রতিভাময়ী। মা-বাবার ছয় সন্তানের মধ্যে তৃতীয় প্রীতি, মেয়েদের মধ্যে বড়। ইংরাজী ১৯১১ সালে তাঁর জন্ম। সংসারের কাজে মাকে কিছু সাহায্য করেন, আর চট্টগ্রামের খাস্তগীর গার্লস স্কুলে পড়তে যান। পড়াশুনাতেও ভাল। মা-বাবার বাধ্য এই প্রীতিলতা। আবার মনে খুব কৃষ্ণভক্তি।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে প্রীতি এলেন ঢাকার ইডেন কলেজে আই. এ. পড়তে। পড়তে পড়তেই দেশের কথা মনে ভাবেন, চট্টগ্রামের আবহাওয়া, গুপ্ত সমিতি যেন তাঁকে হাতছানি দেয়। দেশের এই বিপদে আমি কি চুপ করে থাকবো, এই প্রশ্ন তাঁর মনে। একদিকে পড়াশুনা, মা, বাবা, ভাই-বোন আর একদিকে বিপ্লবের পথ। ওরই মধ্যে খুড়তুতো দাদার কাছে মাস্টারদাদের কাজকর্মের কথা শুনে মনস্থির করে ফেললেন। যোগাযোগ হ'ল মাস্টারদার সঙ্গে। ঐ দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদার যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। সুরু হ'ল কাগজপত্র পড়া, মনকে তৈরী করা। পড়াশুনাও কিন্তু চলছে পুরোদমে, চলছে রোজ ডায়েরী লেখা, ইংরেজী, বাংলায় প্রবন্ধ লেখা। ১৯৩০ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে আই. এ. পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হলেন তিনি।

এবার কলকাতায়। বেথুন কলেজে বি. এ. পড়া সুরু হ'ল। সরকারী কলেজ হলেও এখানকার ছাত্রীরা অনেকে গোপনে রাজনীতি করতেন। লীলা রায়ের 'দীপালী সংঘ' আর কল্যাণী দাসের 'ছাত্রী সংঘ' ছিল মেয়েদের নিয়ে গঠিত। প্রীতি দুই সংঘেই যোগ দিলেন। এইভাবে নিজের মনকে দেশের কাজের উপযুক্ত করে তুললেন তিনি। ওদিকে চট্টগ্রামে যখন থাকতেন নির্মল সেনের কাছে রীতিমত বক্সিং ইত্যাদি খেলা শিখে শরীরচর্চা করতেন।

ক্রমে শরীর মন তৈরী হয়ে উঠলো। রাজনীতিতে সময় দিতে গিয়ে ইংরাজী অনার্স পড়া ছেড়ে দিলেন।

আর অন্যতম দায়িত্ব ছিল কলকাতায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, চাঁদপুর স্টেশনে পুলিশের বড়কর্তা ক্রেজকে মারতে গিয়ে পুলিশেরই কর্মচারী তারিণী মুখার্জীকে গুলি করে মারেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। তাঁকে বন্দী করে কলকাতায় জেলে রাখা হয়েছিল। প্রীতি তাঁর বোনের পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তাঁর কথা শুনে প্রীতি ঠিক করে ফেললেন যে আর দেরী নয়, এবার চট্টগ্রামে গিয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

চট্টগ্রামের নন্দন কানন স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার কাজ পেলেন প্রীতিলতা। সংসারে আর্থিক সাহায্যও দরকার। তাই দু'একটি ছাত্রীও পড়াতে হয়। কিন্তু যোগাযোগ রাখেন মাস্টারদা আর দলের সঙ্গে। শহরের খবরাখবর লুকিয়ে থাকা সূর্য সেনকে জানান আর তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসেন। মাঝে মাঝেই ছাত্রী পড়াতে যাবার নাম করে চলে যান গোপন আস্তানায়। তিনি আর কল্পনা দত্ত যোগাযোগ রাখার প্রধান সেতু।

এইরকমই একদিন ছাত্রী পড়াতে বেরোলেন প্রীতিলতা। কিন্তু সেদিন আর ফিরলেন না। বাড়ীর লোকে ঘুণাক্ষরেও টের পান নি যে প্রীতি মাস্টারদাদের দলে যোগ দিয়েছে। প্রীতি গিয়েছিলেন ধলঘাটের এক গোপন আস্তানায় মাস্টারদার কাছ থেকে নির্দেশ আনতে। হঠাৎ দেখা গেল সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরুণ গুর্খা বাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেলেছে বাড়ীটি। ও পক্ষও ছাড়বার নয়। পিস্তল ছিল কয়েকটা, তাই দিয়েই লড়াই করলেন তাঁরা। নিহত হলেন অপূর্ব সেন আর নির্মল সেন। ক্যামেরুণকে নিহত হল নির্মল সেনের হাতে। অসীম সাহসের সঙ্গে মাস্টারদা প্রীতিকে নিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সেনাদের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

প্রীতি কবে বাড়ী চলে এলেন। কিন্তু নিস্তার নেই। অনবরত পুলিশ আসে, হয়রাণি করে। আর তো পরা যায় না। মাস্টারদা তাঁকেও গোপন আস্তানায় থাকবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে তিনি রাজী নন। কিছু একটা করতে হবে, বার বার ব্যর্থ হয়ে মাস্টারদা তখনই বড় পরিকল্পনা নিতে পারছিলেন না, বিশেষতঃ বহু সঙ্গী জেলে রয়েছেন, অনেকে নিহত হয়েছেন। প্রীতি বলেন যে চুপ করে বসে থাকবো কেন, একটা ছোট ধাক্কাই দেওয়া যাক্ না।

ঠিক হ'ল পাহাড়তলির ইউরোপীয়ান ক্লাব বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। ইংরেজদের ঐ আমোদ গৃহ থাকার কোন দরকার নেই। প্রীতিলতার নেতৃত্বে একটি দল তৈরী হ'ল। বোমা আর পিস্তল নিয়ে রাতের অন্ধকারে তাঁরা এগিয়ে গেলেন ঐ ক্লাবের দিকে। তখন নাচ-গান-হল্লা চলছে ক্লাবের ঘরে। হঠাৎ বোমার শব্দ। চারিদিকে হুড়োহুড়ি, আর্তনাদ। এর আগে দু'বার ব্যর্থ হয়েছে অভিযান। এবার সফল। তিনদিক ঘিরে আক্রমণ করা হয়েছে। ক্লাব ঘর উড়ে গেছে, অনেকে হতাহত হয়েছে।

দলের সবাই খুব খুসী। অধিনায়কের মতই আদেশ দিলেন প্রীতি—এবার সকলে ফিরে যাও, একটু এগিয়েই দলের সঙ্গীরা দেখলেন প্রীতি এগোচ্ছেন না। ডাকেন তাঁরা—দিদি চলে এসো, নইলে ওরা আক্রমণ করবে। স্থির প্রীতি —তোমরা যাও। অধিনায়কের আদেশ অমান্য ক'রার সাধ্য তাদের ছিল না। তাঁরা ফিরে গেলেন। প্রীতিলতা সায়নাইড পান করে মৃত্যুবরণ করলেন।

প্রীতির ছড়িয়ে দেওয়া ইস্তাহারগুলি তাঁদের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের কথা সকলকে নতুন করে জানিয়ে দিল। মৃত্যুর আগের দিন মাকে একটি চিঠি লিখে দুঃখ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন তিনি।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নাম ভারতের ইতিহাসে চিরকালের জন্য লেখা হয়ে রইল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

তিনিই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রক্তের বদলেই স্বাধীনতা আসে, আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশবাসীকে 'চলো দিল্লী' ; বলতে শিখিয়েছিলেন 'জয়হিন্দ'।

বুঝেছো তো তিনি কে ? তিনিই সুভাষচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে দেশ-নায়ক নাম দিয়েছিলেন, দেশবাসী ডেকেছিল 'নেতাজী'।

সুভাষের পিতা জানকীনাথ ২৪ পরগণার মাহীনগরের বসু পরিবারের মানুষ। তিনি কটকে ওকালতি করতেন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব পেয়েছিলেন। তিনি সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটার হয়েছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি কটক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ার সরকারী পদ ছেড়ে দিলেন আর 'রায়বাহাদুর' খেতাবও ত্যাগ করলেন। হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত পরিবারের মেয়ে প্রভাবতী ছিলেন সুভাষের মা। মধুর স্বভাবের এই মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করলেন সুভাষ ১৮৯৭ সালের ২৩ শে জানুয়ারী। মা-বাবা দু'জনের স্বভাবের তেজস্বিতা, মাধুর্য ও ব্যক্তিত্বে প্রভাব পড়েছিলো এই ছেলের উপরে। আর মাস্টারমশাই বেণীমাধব দাসও কম প্রভাবিত করেন নি।

কটকের র‍্যাডেনশ স্কুলের সেরা ছাত্র সুভাষ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় হলেন। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। আর এখানেই সুভাষের তেজ আর জেদের কথা সকলে জানতে পারলে। অধ্যাপক ওটেন সাহেব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কটু কথা বলতেই তীব্র প্রতিবাদ করেন সুভাষচন্দ্র আর অপর কয়েকটি ছাত্র। ব্যাপারটা গড়ালো অনেকদূর। ওঁরা ওটেনকে প্রহার করায় সুভাষকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন সুভাষ আর

দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণী পেয়ে B. A পাশ করলেন। কলেজে পড়তে পড়তেই বিবেকানন্দের আদর্শ মনে মনে গ্রহণ করলেন সুভাষ।

পিতার ইচ্ছায় তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে আই. সি. এস পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় চতুর্থ হলেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপোস করলেন। এটিও ছিল খুব শক্ত পরীক্ষা।

কিন্তু দেশে ফিরে সরকারী চাকরী করতে তাঁর ইচ্ছা হ'ল না। বিবেকানন্দের বাণী তাঁকে ডাকতে থাকে—'ওঠো, জাগো,' সারা দেশে স্বাধীনতার লড়াই সুরু হয়ে গেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ অসহায় ভারতীয়দের হত্যা করেছে। গান্ধীজি আন্দোলন করছেন। সুভাষের প্রাণ অস্থির হয়ে উঠলো। গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। গান্ধীজি পাঠালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে। দেশবন্ধু পেলেন উপযুক্ত শিষ্য, সুভাষ পেলেন গুরু। দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী হলেন সুভাষের মা;

দেশবন্ধু তখন ক'লকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। তখন সুভাষকে করলেন একজন কর্মকর্তা। এখানে বোঝা গেল যে তিনি কত বড় একজন কর্মী। এদিকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে যুবকদের গড়ে তোলার কাজ করতে লাগলেন তিনি। শ্রমিকদের মধ্যেও কাজ করতে লাগলেন। দেশের যুবকদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হলেন। কিন্তু ক্রমে অহিংসার নীতিতে তাঁর বিশ্বাস রইলো না। মনে হতে লাগলো যে স্বাধীনতা চেয়ে পাওয়া যায় না, কেড়ে নিতে হয়। তিলক, অরবিন্দ ঘোষ—এদের বিপ্লবী পথ তাঁকে যেন হাতছানি দিতে লাগলো। গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। আর এই অজুহাতে তাঁকে বন্দী করে মান্দালয় জেলে নির্বাসনে পাঠানো হ'ল। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় বছর তিনেক পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হ'ল।

১৯২৮ সালে কলকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হলেন। তিনি বিরাট এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করলেন, মেয়েরাও যোগ দিলেন, সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করা শেখানো হ'ল। সামরিক পোষাক তৈরী হ'ল। বিরাট শোভাযাত্রা করে এই সুশৃঙ্খল বাহিনী কংগ্রেস সভাপতি,—যাঁকে বলা হ'ত 'রাষ্ট্রপতি'—মতিলাল নেহরুকে হাওড়া স্টেশন থেকে ময়দানে নিয়ে এল। এই বাহিনীতে শুধু কংগ্রেসীরাই নয়, যুগান্তর, অনুশীলন, পূর্ণদাসের দল, সূর্য সেনের দল, মুক্তি সংঘ—প্রায় সব দলের সভ্যরাও যোগ দিলেন। অবশ্য তখন

সব দলই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতেন। যাই হোক এই, শোভাযাত্রা দেখতে লোকের ভিড় উপচে পড়লো, রাস্তায়, বাড়ীর জানালায়, বারান্দায়, ছাদে। চৌত্রিশ ঘোড়ায় টানা রাষ্ট্রপতির গাড়ী, আর এক গাড়ীতে তাঁর স্ত্রী ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা আর গাড়ীর আগে মোটর সাইকেল বাহিনী, সাইকেল বাহিনী, পতাকা বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী বাদক আর পিছনেও অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনী, আর সদস্য ও সাধারণ লোক। খোলা মোটরে সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র। কি শৃঙ্খলাবদ্ধ শোভাযাত্রা। সুভাষ হয়তো সেদিনই স্বপ্ন দেখেছিলেন সেনাবাহিনী গড়ে তোলার। অবশ্য গান্ধীজি এ ব্যাপারটা পছন্দ করলেন না, তিনি ছিলেন অহিংসার পূজারী। এই অধিবেশনেই সুভাষ বললেন যে পুরোপুরি স্বাধীনতা চাই আমাদের।

চট্টগ্রাম বিপ্লব সুরু হল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। সুভাষ তখন জেলে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবের কথা জেনে তাঁর কি আনন্দ! এদিকে আলিপুর জেলের বন্দীরা একটু ভাল ভাবে থাকার দাবী করাতে জেলের সুপারিটেন্‌ডেন্ট মেজর সোমদত্ত লাঠি পেটা করলেন তাঁদের, সুভাষও আহত হলেন। বিপ্লবীরা সোমদত্তের রক্ত নেবার চেষ্টা করলেন; সোমদত্তও পালালেন বাংলা থেকে।

গান্ধীজির সঙ্গে বড়লাটের চুক্তিমত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। কিন্তু ভগৎ সিং প্রমুখদের মুক্তি হ'ল না। ভগৎ সিংদের ফাঁসী যাতে না হয় তার জন্যও সুভাষ কত চেষ্টা করলেন। কিছুতেই কিছু হ'ল না, ওঁদের ফাঁসী হ'ল, হিজলী জেলের মধ্যে গুলি করে মারা হ'ল বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত আর সন্তোষ মিত্রকে। গোপীনাথ সাহার ফাঁসী হল। সুভাষ সর্বত্র সভা করতে লাগলেন।

১৯৩২ সালে তাঁকে বন্দী করে অসুস্থতার জন্য ভিয়েনায় পাঠানো হ'ল। মাঝে একবার অসুস্থ পিতাকে দেখাতে আনা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে মুক্তি পেয়ে ফিরলেন স্বদেশে। চারিদিকে সম্বর্ধনা। কংগ্রেসের সভাপতি করা হ'ল তাঁকে। হরিপুরায় কংগ্রেসের সভায় তিনি বললেন, ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়। কংগ্রেসে আর তাঁকে গান্ধীজি প্রেসিডেন্ট করতে চাইলেন না। তাঁর প্রতি অবিচারের দুঃখ পেয়ে কংগ্রেস ছেড়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন।

এবার তিনি ছাত্রদলকে নিয়ে হল ওয়েল মনুমেণ্ট ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করলেন,

হল ওয়েল ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা লিখেছিলেন। কিন্তু সুভাষকে বন্দী করা হ'ল। স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে গেল যে জেল থেকে এনে বাড়ীতে বন্দী করে রাখা হ'ল। কড়া পাহাড়া থাকলেও ভেতরে ভেতরে সব ব্যবস্থা ঠিক করা ছিল। সবাইকে স্তম্ভিত করে ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী বাড়ী থেকে চলে গেলেন সুভাষ আফগানিস্থান আর সেখান থেকে জার্মানি। হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করে তাঁর সাহায্যে জার্মানির ভারতীয় বন্দীদের নিয়ে তৈরী হ'ল আজাদ হিন্দ বাহিনী। এঁরাই ডাকলেন তাঁকে 'নেতাজী' নামে। রেডিওতে সকলে শুনলেন তাঁর বক্তৃতা।

এদিকে জাপানে রাসবিহারী বসু ভারতীয়দের নিয়ে একটি দল আর একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন, বৃদ্ধ তিনি। ডেকে পাঠালেন সুভাষ তুমি এসো। সুভাষ অসীম দুঃসাহসের ভর করে জার্মান সাবমেরিণে করে ঐ দারুণ যুদ্ধের সময় অতদূর থেকে জাপানে এলেন। ঘরের কাছে থাকলে ইংরেজ তাড়ানোর সুবিধে হবে। কি বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন তিনি। জাপানী প্রধানমন্ত্রী সবরকম সাহায্য করতে লাগলেন। তৈরী হ'ল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে সুভাষ স্থাপন করলেন আজাদ হিন্দ সরকার। জাপান, বর্মা, চীন, জার্মানি, ইতালি এই সরকারকে মেনে নিলেন। জাপান সরকার সুভাষের হাতে আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপ দুটি দিলেন, নতুন নাম হ'ল তাদের শহীদ দ্বীপ আর স্বরাজ দ্বীপ।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধের জন্য তৈরী। মেয়েরাও আছেন সেনাবাহিনীতে। সুভাষের সঙ্গে আছেন এস. এ. আয়ার, কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী, কর্ণেল ভোঁসলে, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল আজিজ আহ্‌ম্মদ্‌, শাহনওয়াজ, লোকনাথন, দেবনাথ দাস, লক্ষ্মী স্বামীনাথন প্রভৃতি। সকলের উপরে রাসবিহারী। বিভিন্ন দলের নাম রাখা হল গোষ্ঠি, ব্রিগেড, নেহরু বিগ্রেড, আজাদ বিগ্রেড, ঝাঁসি বিগ্রেড, সৈন্যরা একটি দলের নাম দিলেন সুভাষ বিগ্রেড,। সমর সঙ্গীত 'কদম কদম বড়ায়ে যা'। জাপানী বাহিনীর পাশে পাশে আবার একাই এঁরা যুদ্ধ করতে লাগলেন ইংরেজদের সঙ্গে। বর্মা সীমান্ত পেরিয়ে ফৌজ ভারতের মাটিতে পা রাখলেন ১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ। কোহিমা, ময়রাং, ইম্ফল, জয় হ'ল। সে কি আনন্দ!

কিন্তু জাপানের আর শক্তি ছিল না যুদ্ধ চালাবার। এটম বোমা পড়ার পর জাপান যুদ্ধ বন্ধ করলে। আজাদ হিন্দ ফৌজও যুদ্ধ চালাতে পারলে না। অস্ত্র নেই, রসদ নেই। শুধু দেশের প্রতি ভালবাসা দিয়ে তো আর যুদ্ধ

চালানো যায় না। বেশীর ভাগ আজাদী সেনা বন্দী হলেন। শোনা গেল তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে।

জানি না, এ ঘটনা সত্যি কিনা। যে সুভাষের কথা তোমরা পড়লে সেই মহান দেশ প্রেমিকের কথা মনে রেখো। মনে রেখো, তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। সারা ভারতবাসী জেগে উঠেছিল। ভারত স্বাধীনতা পেল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট।

নেতাজী তোমাকে প্রণতি জানাই। প্রণতি জানাই রাসবিহারী বসুকে। প্রণাম জানাই আজাদী সেনা আর সেনাপতিদের। তোমাদের সঙ্গে একসুরে বলতে চাই—'ইত্তেফাক্, ইতিমাদ, কুরবানি' অর্থাৎ 'একতা, বিশ্বাস, বলিদান'।

মজনু ফকির

১। মজনু শাহ কিভাবে দল গঠন করেন ?
২। তিনি এবং তাঁর দলের লোকেরা কি কাজ করতেন ?
৩। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে যে ঘটনাটি ঘটে তা সবিস্তারে লেখ।
৪। কোথায় তাঁর জীবনাবসান হয় ?

বাঁশের কেল্লা

১। তিতুমীরের পোশাকী নাম কি ছিল এবং তাঁর বাড়ি কোথায় ছিল ?
২। তিতুমীর দেশে ফিরে কি ঠিক করলেন ?
৩। ওয়াহাবী প্রজাদের শাস্তি দিতে তিনি কি করলেন এবং এর ফল কি হয়েছিল ?
৪। 'বাঁশের কেল্লা' কে গঠন করেন ? তার ভেতর কি ছিল ?
৫। কিভাবে এবং কেন সেই কেল্লাকে ভেঙে দেওয়া হল ?

হুলহুল

১। সাঁওতালদের জীবিকা কি ছিল ?
২। তাদের ওপর কি অত্যাচার চলত ?
৩। চুণার মুর্মুর বাড়ি কোথায় ? সেখানে কাদের জন্ম হয়েছে এবং তাদের নাম কি ?
৪। তারা কিভাবে দল গঠন করেছিল ? দল গঠন করে তারা কি করলো ?
৫। তাদের দমন করার জন্য ইংরেজরা কি করেছিল ?

মৌলবী আহ্‌মদ উল্লাহ শাহ

১। মৌলবী আহ্‌মদ উল্লাহ শাহ কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতার নাম কি ?
২। তিনি কোন্ দল গঠন করেন এবং সেই দলের উদ্দেশ্য কি ছিল ?
৩। কেন আহমদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ?
৪। মহাবিদ্রোহ শুরু হওয়ার কি ফল হয়েছিল ?

ঝাঁসির রাণী

১। লক্ষ্মীবাঈ কি করতে ভালবাসতেন ?
২। রাজ্য শাসনের ভার নেওয়ার পর তিনি কিভাবে রাজ্য চালাতেন ?
৩। মহাবিদ্রোহের প্রভাব ঝাঁসিকে কিভাবে গ্রাস করেছিল ?
৪। ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিভাবে তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ?

উলগুলান

১। কোল জাতিরা কিভাবে জীবনযাপন করত ?
২। কিভাবে ইংরেজরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করত ?
৩। কে তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন ? তাঁর নাম কি ?
৪। বীরসা কি নির্দেশ পেয়েছিলেন ?
৫। এই নির্দেশ শোনার পর ইংরেজরা কি করেছিল ?
৬। জেল থেকে বেরিয়ে বীরসা কি করলেন এবং তাঁর পরিণতি কি হয়েছিল ?

আল্লুরি সীতারাম রাজু

১। আল্লুরি সীতারাম রাজু কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি ?
২। সীতারাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ?
৩। ইংরেজরা কিভাবে তাঁকে দমন করতে চেয়েছিল ?

বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে

১। বাসুদেব কোন পরিবারের ছেলে ছিলেন এবং তাঁর ছেলেবেলা কিভাবে কেটেছিল ?
২। তিনি ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য কি ভেবেছিলেন ?
৩। তিনি কিভাবে দল গঠন করেন ?
৪। ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিভাবে তিনি সংগ্রাম করেন তা বিশদভাবে আলোচনা কর।

চাপেকার ভাইয়েরা

১। চাপেকার ভাইয়েরা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? তাঁদের নাম কি ছিল ?
২। প্লেগ রোগীকে সেবা করার অজুহাতে ইংরেজরা কি অত্যাচার করত ?
৩। কিভাবে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিল ?
৪। কত খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের ফাঁসি হয় ?

শহীদ আজম ভগৎ সিং

১। কে প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ?
২। তিনি কিভাবে ছাত্রদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রেরণা দিতেন ?
৩। পাঞ্জাবের ঘটনা বর্ণনা কর।
৪। পাঞ্জাবের ঘটনা কিভাবে তাঁকে নাড়া দিয়েছিল ?
৫। এর ফলে পুলিশের সঙ্গে তাঁর কি বিরোধ হয়েছিল ?
৬। তাঁর বিচার শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল ?

চন্দ্রশেখর আজাদ

১। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে কি ব্রত গ্রহণ করা হয় ?
২। চন্দ্রশেখর আজাদ্ পুলিশের জবাবে কি উত্তর দিয়েছিল ?
৩। কিভাবে তিনি ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ?
৪। কিভাবে তিনি ধরা পড়লেন এবং কিভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন ?

চিরবিপ্লবী রাসবিহারী

১। কিভাবে রাসবিহারী বিপ্লবী দলে যোগ দেন ?
২। কিভাবে তিনি পুলিশের ওপর বোমা ছুঁড়েছিলেন ?
৩। কি আয়োজন তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল ?
৪। তিনি জাপানে গিয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?
৫। তিনি জাপান থেকে কি সম্মান পান ?

স্বাধীনতার সূর্য, সূর্য সেন

১। সূর্য সেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? তাঁর পিতা মাতার নাম কি ছিল ?
২। কিভাবে দেশের প্রতি তাঁর মন আকৃষ্ট হল ?
৩। স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য তিনি কি কি কাজ করেছিলেন ?
৪। সূর্য সেন কিভাবে ধরা পড়েছিলেন ?
৫। সবাই তাঁকে কি বলে ডাকত ? কত সালে তাঁর ফাঁসি হয় ?

প্রীতিলতা

১। প্রীতিলতা কি প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন ? তিনি কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
২। প্রথম জীবনে কোথায় কিভাবে পড়াশুনা করেন ?
৩। কিভাবে তাঁর সঙ্গে বিপ্লবীদের পরিচয় ঘটে ?
৪। প্রীতিলতা কিভাবে তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দিতেন ?
৫। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয় ?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

১। সুভাষচন্দ্র কিভাবে নেতাজী উপাধি পেয়েছিলেন ? তিনি কোথায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?
২। তিনি ছেলেবেলায় কিভাবে পড়াশুনা করেছিলেন ?
৩। সুভাষচন্দ্র কিভাবে তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দিতেন ?
৪। চট্টগ্রাম বিপ্লব কত সালে হয়েছিল ? সুভাষচন্দ্র তখন কোথায় ছিলেন ?
৫। ভারত কত সালে স্বাধীনতা লাভ করেছিল ?